২০২৩-২৪

সৃষ্টি

বার্ষিক পত্রিকা

ভাঙড় মহাবিদ্যালয়

ভাঙড়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

Faculty Members with honourable GB President

College NSS Unit I& II

College NCC Unit

College Cricket Team with GB member Sabirul Islam

Arabic Language Day

DEPARTMENT OF ENGLISH- EDUCATIONAL EXCURSION TO JORASANKO THAKURBARI

Inauguration of Wall Magazine Dept of Philosophy

NSS Day Celebration

সৃষ্টি

SRISTI

ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয় পত্রিকা

২০২৩-২৪

Bhangar Mahavidyalaya
College Magazine

ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়

ভাঙ্গড়, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

সৃষ্টি
ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয় পত্রিকা
SRISTI
Bhangar Mahavidyalaya College Magazine

প্রকাশঃ ২০২৩ - ২০২৪

সভাপতি	ঃ	ড. বীরবিক্রম রায় অধ্যক্ষ, ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়
সম্পাদক মন্ডলী	ঃ	ড. মালিকা সেন ড. নিরুপম আচার্য ড. সংযুক্তা চক্রবর্তী ড. তথাগত দাস ড. আলি রাজা অধ্যাপক দয়ালহরি সরদার ড. পূর্বাশা বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যাপিকা রুমনা সরকার
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা	ঃ	সম্পাদক মন্ডলী
প্রকাশক	ঃ	ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয় ভাঙ্গড়, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।
মুদ্রক	ঃ	রাজ প্রিন্টিং এন্ড ডি.টি.পি সেন্টার ভাঙ্গড়, দঃ ২৪ পরগণা। ৯৭৩২৬৬২০৫৪

সূচি ঃ

পৃষ্ঠা নং
সম্পাদকীয়- ৪
Message from President, Governing Body Bhangar Mahavidyalay ৫
অধ্যক্ষের কলমে - ড. বীরবিক্রম রায় ৬
সরকার মনোনীত প্রতিনিধির কলম ৭
হেড ক্লার্কের ডেক্স থেকে - মহঃ কুদ্দুস আলি ৮
সাহসবাবুর সাহসিকতা - বীরবিক্রম রায় ৯ - ১০
আধুনিক যুগেও চাণক্যের বিভিন্ন নীতিগুলির প্রাসঙ্গিকতা (১) সম্পর্কে কিছু কথা -
নন্দা ঘোষ, অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ ১১ - ১৩
শতরঞ্জ কে খিলাড়ী ও সমকালীন ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট -
অপরূপ চক্রবর্তী, অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ ১৪ - ১৫
Nim Sarai Minar : "Unique Instance of Muslim Sculpture -
Soma Roy, Dept. of History ১৬
An Exodus From Believes to Reasons -
Dr. Kausatav Sen Dept. of Physics ১৭ - ১৮
এক রাতের গল্প / পুনর্জন্ম - নাজরিনা পারভীন, ইতিহাস অনার্স, সেমিস্টার-৬ ১৯ - ২০
সত্যিই কি ভূত ! - সাহিনা খান, ইংরাজী অনার্স, সেমিস্টার - ৪ ২১
বলতে না পারা কিছু কথা - ইমরান মোল্যা, বি.এ অনার্স, সেমিস্টার - ২ ২২ - ২৮
মুহূর্ত - মোঃ কাইজার রহমান মোল্যা, সেমিস্টার - ৬ ২৯
টুটা প্যার - ফরিদা খাতুন ৩০
জুনুন - Santanu Biswas, Eng (Hons.), 4th Sem. ৩০
BEING A WEB DEVELOPER - Mohibar Rahaman, Data Manager ৩১
The Incarcerated Poet - Tathagata Das, Associate Professor, Dept. of English ৩২
বছর কুড়ি পরে - ড. পূর্বাশা বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ ৩৩
বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে - শান্তনু বিশ্বাস, ইংরাজী অনার্স, সেমিস্টার - ৪ ৩৩
আজও কেন যুদ্ধ ? - দেবদূত মুখার্জী, অধ্যাপক, ইংরাজি বিভাগ ৩৪
ঝরা পাতার কাব্য - নাজমুন নাহার, অধ্যাপিকা, আরবী বিভাগ ৩৪
তুমিই সেই নারী - আলমগীর উদ্দিন, সেমিস্টার - ৬ ৩৫
আমার বসন্ত - সুপ্রিয়া মন্ডল, ইংরাজি অনার্স, সেমিস্টার - ৪ ৩৬
মুখ ও মুখোশ - রুমনা সরকার, অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ ৩৭
এক মুঠো ভাত - সাইদুল মোল্যা, এডুকেশন অনার্স, সেমিস্টার - ২ ৩৭
কেউ যদি জানতো - প্রিয়া পাল, এডুকেশন অনার্স, সেমিস্টার - ৪ ৩৮
জীবন যেমন - নূর মোহম্মদ মোল্লা (অপু), শিক্ষা-সহায়ক (কর্মী) ৩৮
চিত্র - নারগিস পারভীন, ইতিহাস অনার্স / দিব্যেন্দু মন্ডল, ইতিহাস অনার্স ৩৯
BHANGAR MAHAVIDYALAYA - Students' Council ৪০

সম্পাদকীয়

‘‘সৃষ্টি’’ পত্রিকার ২০২৩-২০২৪ সংখ্যা প্রকাশিত হলো। পাঠকের ভালোবাসা, প্রশংসা আর সমালোচনা সৃষ্টির আগামীর পথকে আরো মসৃণ করে তুলবে আশা রাখি। যাঁরা লেখা দিয়ে এই সংখ্যাকে সমৃদ্ধ করলেন তাঁদেরকে জানাই আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। প্রত্যাশা রাখি যে তাঁরা ভবিষ্যতেও এইভাবে তাঁদের সৃজনশীল সৃষ্টিকর্মের দ্বারা আমাদের ‘‘সৃষ্টি’’কে আরও অনেক বেশি সাবলীল করে তুলতে সহায়তা করবেন। আরও আশা রাখি যে এই পত্রিকাটি আমাদের মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সৃজনশীলতা ও প্রতিভাকে উদ্দীপিত ও বিকশিত করবে।

I am very happy to know that the College Magazine'Sristi' is going to be published.This publication is a reflection of creativity, talent and initiative of our students. I extend my warmest congratulations to our students for their outstanding contributions. I also appreciate the tireless efforts of our teachers and staff who have guided and supported our students in this endeavour.

I hope that this Magazine will serve as a source of inspiration for our students, faculty members and staff. It is a testament to the vibrant academic and cultural life of our college.

Regards,

Md Baharul Islam
President
Governing Body
BhangarMahavidyalaya

অধ্যক্ষের কলমে

২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের কলেজ পত্রিকা ''সৃষ্টি'' প্রকাশ পেতে চলেছে। ইতিমধ্যে তৃতীয় পর্যায়ের ন্যাকের পরিদর্শনের জন্য মহাবিদ্যালয় তৈরী হচ্ছে। সেই কাজের প্রস্তুতি পর্ব চলছে অতি দ্রুতলয়ে। অধ্যাপক অধ্যাপিকা শিক্ষাকর্মী বন্ধুরা সকলেই প্রাণপাত পরিশ্রম করে চলেছেন। তার ওপর আছে সেমেস্টার নিয়মে ঘন ঘন পরীক্ষা। আমাদের মতো বড়ো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দৈনন্দিন কাজ করাটাই একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। তার ওপর ন্যাকের কাজের পুরোটাই সম্ভব হচ্ছে সকলের মিলিত প্রচেষ্টায়। এই বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের সহায়তাও মনে রাখার মতো। মহাবিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতিতে লক্ষ্যণীয়র বদল হয়েছে।

নতুন সভাপতি হয়েছেন এই মহাবিদ্যালয়েরই প্রাক্তনী মোহাম্মদ বাহারুল ইসলাম (বাপ্পা)। এতে আমরা খুব গর্বিত এবং আশাবাদী। তাঁকে যোগ্যসঙ্গত করার জন্য সরকারের নতুন প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন মোহাম্মদ সাবিরুল ইসলাম (রিন্টু)। তাঁদের সুযোগ্য নেতৃত্বে মহাবিদ্যালয় নতুন দিশা পাবে বলে আমার বিশ্বাস। এতো কর্মকান্ডের মধ্যেও সৃষ্টির তাগিদতো থেকে যায়। ইংরেজি প্রবাদ আছে You can rely most on the most busy person. অর্থাৎ অসল কাউকে কোনো কাজের দায়িত্ব দেবার থেকে ভালো যিনি খুব ব্যস্ত থাকেন তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া। কেন না তাঁর হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি কোনো কাজ ফেলে রাখেন না। আমাদের পত্রিকা-সম্পাদকমন্ডলী ও ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রেও সেই কথাটি খাটে। তাঁদের অনেক মাঝেও তাঁরা ''সৃষ্টি'' পত্রিকা প্রকাশের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখেছেন। তাঁদের জন্য ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে সাহিত্যচর্চা, অঙ্কনচর্চা করেছে তাদের। ধন্যবাদ জানাই মুদ্রককে। সৃষ্টির পুনর্জন্ম হোক। অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছি সেই মুহূর্তের দিকে।

ধন্যবাদান্তে -
ডঃ বীরবিক্রম রায়
অধ্যক্ষ
ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়

শুভেচ্ছা বার্তা

ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়ের পত্রিকা ''সৃষ্টি'' প্রকাশের পথে এ কথা জেনে আনন্দিত হলাম। আরো নতুন নতুন সৃষ্টির বার্তা নিয়ে ''সৃষ্টি''র যাত্রাপথ গৌরবোজ্জ্বল হোক। নবীন প্রতিভার সুসংহত বিকাশের মাধ্যম হয়ে উঠুক এই পত্রিকা। এই পত্রিকা প্রকাশের সাথে যুক্ত সকলকে ধন্যবাদ ও আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। সর্বোপরি এই পত্রিকার সর্বাঙ্গীন বিকাশ কামনা করি।

সাবিরুল ইসলাম
পশ্চিমবঙ্গ সরকার মনোনীত
পরিচালন সমিতির সদস্য
ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়

।। হেড ক্লার্কের ডেস্ক থেকে।।

প্রকাশের পথে ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়ের ২০২৩-২৪ এর পত্রিকা 'সৃষ্টি'। ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগ ও উৎসাহে নিয়মিত এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের সৃজনী শক্তির পরিচয় ঘটাতে পারে। পত্রিকার সম্পাদক মন্ডলী এবং হিতাকাঙ্খী পাঠক-পাঠিকাদের ধন্যবাদ জানাই এবং পত্রিকার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

মোঃ কুদ্দুস আলি
হেড ক্লার্ক
ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়

সাহসবাবুর সাহসিকতা

বীরবিক্রম রায়

বাড়িটার নাম ''শান্তিবিলাস'' তবে লোকে ঠাট্টা করে ডাকে ''ভ্রান্তিবিলাস''। গৃহকর্তা হলেন সাহস রায় কিন্তু কিছু মিচকে লোক তাকে ডাকে ঢেঁড়স রায় নামে। কারণ তিনি তার পিসিমার ভয়ে সারাক্ষণ সিঁটিয়ে থাকেন আর সবকিছু গুলিয়ে ফেলেন। এই তো সেদিন পিসিমা ঠাকুর ঘর থেকে হেঁকে বললেন - ''এই সাহস্যা, বামুন মারে গিয়া ক' এঁচোড়ের কোপ্তা করতে''। সাহস বাবু দায়িত্ব নিয়ে বামুন মাকে কাঁচকলার কোপ্তা করতে বলে দিলেন। আর তার শাস্তি স্বরূপ অফিস যাবার আগে পুরো এক জামবাটি ভর্তি কাঁচকলার কোপ্তা খেয়ে শেষ করে তারপর অফিস যেতে পারলেন। উপরন্তু খাবার সময় অনুপান হিসেবে পেলেন পিসিমার পদ্মাপারের বাছাই করা বিশেষণ সমূহ - অকম্মার ঢেঁকি, অলম্বুষ, নির্বংশার পুত ইত্যাদি ইত্যাদি। আর উপরি পাওনা হিসেবে জুটলো তিন দিনের বড় বাথরুমের লকআউট।

সাহসবাবুর সবসময়ই মনে যে অল্প বয়সে বিধবা হবার ফলে পিসেমশাইয়ের উপর হম্বিতম্বির কোটাটা পিসিমা বোধ হয় পূর্ণ করতে পারেননি। তাই তিনি কারণ অকারণে এত তর্জন গর্জন করেন। সাহস বাবুর বাবা অকুতোভয় রায় ও তার মা রণরঙ্গিনী দেবী সাহসবাবুর খুব ছেলেবেলায় মারা যান। তখন থেকেই সাহসবাবু পিসিমার কাছে মানুষ। ছেলেবেলা থেকেই সাহস বাবুকে কড়া শাসনে বেঁধে রেখেছেন পিসিমি। পান থেকে চুন খসলেই সাহস বাবুর কানের পাশে পিসিমা তার দোক্তা খাওয়া ভাঙাচোরা দাঁত বের করে একেবারে আলসেশিয়ান এর মত খ্যাঁক খ্যাঁক শুরু করেন দেন। দুরু দুরু বুকে সাহসবাবু পিসিমার সব গালাগালি সহ্য করেন। অর্ধেক বোঝেন আর বাকিটুকু শুধু দাঁতখেচানি দেখে আন্দাজ করেন। পিসিমার গালাগালির থেকেও বড় ভয়ের ব্যাপার হলো এই যে রেগে গেলেই পিসিমার অদ্ভুতভাবে ক্ষুধামান্দ্য হয়। পরপর কদিন না খেয়ে থাকলে পিসিমার রক্তচাপ হু হু কমে যায়। তারপর ডাক্তার বাবু যত না ওষুধ দেন তার থেকে বেশি গালাগালি করেন সাহসবাবুকে। তাই এই ভয়ে সাহসবাবু সর্বদা সিঁটিয়ে থাকেন। আর যত ভয় পান ততই যেন আরো সব তালগোল পাকিয়ে যায়।

এইতো সেদিন পিসিমা বললেন - ''এই সাহস্য তুই ''একখাবলা'' থাইকা একটু নিখুঁতি লইয়া আয় তো। ''একখাবলা'' হল পাড়ার মিষ্টির দোকান। সেখানকার ল্যাংচা খুবই বিখ্যাত। সাহস বাবু সেখান থেকে এক কেজি নিখুঁত ল্যাংচা নিয়ে এলেন। দোকানিকে বলেও এলেন ''দেখুন পিসিমা খাবেন, একটা ল্যাংচাতেও যেন খুঁত না থাকে।'' আর তার কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল পাড়ার লেলো ভেলো কুকুর - বিড়াল মাটিতে গড়াগড়ি দেওয়া ল্যাংচাগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাচ্ছে আর ''শান্তি বিলাসের'' বাইরে দাঁড়িয়ে সাহস বাবু সহাস্যে কৌতুহলী প্রতিবেশীদের বোঝাচ্ছেন যে তার মাথায় ওই জবজবে ভাবটা মোটেও ল্যাংচার রসের জন্য নয়, তেল মাখতে গিয়ে নবরত্ন তেল মাথায় একটু বেশি পড়ে গেছে এই আর কি।

এমনি করেই দিব্যি কেটে যাচ্ছিল শান্তিবিলাসের দিনগুলো। হঠাৎ পিসিমার কেন জানি মনে হল তিনি আর বেশিদিন নেই। যদিও সাহস বাবু সমেত বাড়ির চাকর মালি ড্রাইভার সকলের প্রতি উচ্চগ্রামে বর্ষিত ক্লান্তিহীন গালাগালি তা কখনোই প্রমাণ করে না। যাইহোক, পিসিমা স্থির করলেন সাহস বাবুর শিগ্গির একটা বিয়ে দিয়ে দেওয়া দরকার। আনন্দবাজার পত্রিকার ''রবিবাসরীয়'' তে পাত্র পাত্রীর বিজ্ঞাপন দেখে পিসিমা একটি পাত্রীও দেখে ফেললেন। পিসিমার প্রশংসার বন্যা আর যৌতুকের বহর শুনে সাহস বাবু কেন জানি রাজি হয়ে গেলেন। ছবি দেখে মেয়েটিকে দেখতে খুব একটা খারাপও লাগলো না। অনেকদিন পর হই হই করে ''শান্তিবিলাস'' আলোর সাজে সেজে উঠলো। বেজে উঠল সানাইয়ের সুর। কিন্তু বিপত্তি ঘটলো শুভদৃষ্টির সময়। মেয়েটি আনত নয়নযুগল ধীরে ধীরে তুলে যেই সাহস বাবুর দুচোখে চোখ রেখেছে তখনই সাহসবাবু দেখলেন মেয়েটি ট্যারা। এতক্ষণে বুঝলেন কেন পিসিমা এতবার করে মেয়েটি ''ভারী লক্ষ্মী'' ''ভারী লক্ষ্মী'' বলে চলেছিলেন এবং কেন এই বাজারে সাহসবাবুর মত ছেঁদো পাত্রও এত যৌতুক পেতে পারেন।

তারপর জীবনে প্রথমবার সাহসে ভর করে বাঁ হাতে ধুচির কোঁচটাকে চেপে ধরে সাহসবাবু বিয়ের মন্ডপ ছেড়ে মারলেন এক ছুট !

তারপরের গল্প খুব সংক্ষিপ্ত। এই ঘটনার পর সাত দিন না খেয়ে পিসিমা এখন নার্সিংহোমে স্যালাই নিচ্ছেন আর ওই নার্সিংহোমেই সাহস বাবুর কানে হিয়ারিং এইডস বসেছে।

আধুনিক যুগেও চাণক্যের বিভিন্ন নীতিগুলির প্রাসঙ্গিকতা (১) সম্পর্কে কিছু কথা -

নন্দা ঘোষ

অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ

চাণক্য, যিনি কৌটিল্য বা বিষ্ণুগুপ্ত নামেও পরিচিত। তিনি খ্রিষ্টপূর্ব ৩৭৫ সালে তক্ষশীলায় জন্মগ্রহণ করেন। একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে। তৎকালীন ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত তক্ষশীলায় লেখাপড়া করেন শৈশবে বেদ অধ্যয়ন করেন। তৎকালীন সমাজে সব বিষয়ে চর্চাই ছিল প্রচলন - আমরা 3R -এর কথা জানি।

Reading

(W) riting (W উহ্য)

(A) rithmetic (A উহ্য)

চাণক্যের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। তিনি রাজনীতি, অর্থনীতি, কুটনীতি, দর্শন, নীতিশাস্ত্র, এমনটি বর্তমানে যাকে আমরা MANAGEMENT STUDIES বলে থাকি - সেটিতেও তাঁর পাণ্ডিত্য লক্ষণীয়। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ অর্থশাস্ত্র একটি Masterpiece হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং শাসন, কূটনীতির অন্তর্দৃষ্টির জন্য ভীষণরকম অধ্যয়ন করা হয়। ২০০০ বছর আগে রচিত হওয়া সত্বেও এগুলি আজও একই রকম ভাবে প্রাসঙ্গিক। নেতৃত্ব, পরিচালনা, দ্বন্দ্ব সমাধান এবং কূটনীতি - ইত্যাদি নানা দিকে এগুলি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

তার প্রধান নীতিগুলির মধ্যে শিক্ষার গুরুত্ব অন্যতম, এছাড়া

Self-respect / আত্মাসম্মান,

Leadership / নেতৃত্ব

Success / সাফল্য

এগুলিও অত্যন্ত মূল্যবান।

তিনি বিশ্বাস করতেন যে জীবনে সাফল্য অর্জনে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে - অর্থনীতি, রাজনীতি, যুদ্ধের ক্ষেত্রে সকলকে সুশিক্ষিত হবার পরামর্শ দিয়েছেন।

আজ-ও এই ধারণাটি প্রাসঙ্গিক কারণ একটি ভালো শিক্ষা ব্যক্তিগত ও পেশাগত বুদ্ধি এবং সাফল্যের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন।

তিনি মানুষের শক্তি ও দূর্বলতা বিচার করার ক্ষমতা কথা বলেছেন, চরিত্র ও উদ্দেশ্য শনাক্ত করার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

কৌশলগত চিন্তাভাবনা, কূটনীতির ওপর চাণক্যের শিক্ষাগুলি এখনো অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ক্ষমতা অর্জন এবং ধারণ-এর জন্য 'কৌশল' এবং দ্বন্দ্ব, সমস্যা সমাধান, বিরোধ মীমাংসার জন্য কূটনীতি ব্যবহার তাঁর অন্যতম অবদান।

চাণক্য নেতৃত্ব ও শাসন ব্যবস্থার নৈতিকতার ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। একজন শাসকের / জনপ্রতিনিধি মূল্যবোধ বজায় রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। জনগণের সমর্থন যদি রাখতে হয় তবে দায়িত্বশীল নেতৃত্ব অপরিহার্য।

বলা বাহুল্য আধুনিক যুগেও আস্থঅ, ভরসা, বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরির জন্য নেতাদের নৈতিক মূল্যবোধ অটুট রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন।

এছাড়া চাণক্য বিশ্বাস করতেন যে রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য শাসকের শক্তিশালী আর্থিক ভিত্তি থাকা প্রয়োজন।

তাই সম্পদ ব্যবস্থাপনার কথাও তিনি বলেছেন -

এই শক্তিশালী / মজবুত আর্থিক ভিত্তি আজকের যুগেও অত্যন্ত জরুরি, নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও এটি অপরিহার্য।

সুশাসন ও সামাজিক ন্যায়-বিচারের সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভারসাম্য সম্পর্কে চাণক্যের ধারণা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

আমরা জানি যে যে কোনো সমাজে ‘কল্যাণ’-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে।

অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন তার Welfare Economics সম্বন্ধে বলেছেন সেরকম আমাদের সবকিছুই - রাষ্ট্রনীতি, দর্শন, নীতি, ‘কশন কর’ হওয়া প্রয়োজন। যা জনসাধারণের জীবন মঙ্গলময় করে তুলবে। এছাড়া সামাজিক সাম্য, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অত্যন্ত জরুরী।

জনগণের চাহিদা, প্রয়োজন, (এখানে প্রয়োজন অর্থে চাহিদা বুঝতে হবে)। সমাজ/রাষ্ট্রের কল্যাণ-এর কথা মনে রেখে সুশাসন এবং প্রশাসনিক উন্নতি সর্বসময়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

জীবনে সাফল্য অর্জন করা আমাদের সকলেরই কাম্য - কিভাবে সহজ সরল ভাবে জীবনযাপন করা যায়, কীভাবে জীবনের অবশ্যম্ভাবী সমস্যা দূর করে চলার পথ মসৃণ করা যায় এবং কিভাবে জীবনে সাফল্য লাভ হবে এ সম্বন্ধে চাণক্য বেশকিছু কথা বলেছেন। - এদের মধ্যে

১. সবাইকে নিয়ে চলা ঃ কারোর প্রতি দ্বেষ, ইর্ষা না রেখে সকলকে নিয়ে চললে সবাই পছন্দ করবে এবং কঠিন কাজ সহজ হবে।

২. সহকর্মীদের সম্মান ঃ সবার সাহায্য না পেলে, একা কোন কাজ করা সম্ভব নয়, তাই সকলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করলে তবেই উন্নতিসাধন সম্ভব।

৩. উৎসাহ ঃ সবাইকে, সকলের যথাযথ প্রতিভাকে একইভাবে মূল্য দিয়ে উৎসাহিত করতে হবে।

এছাড়া নিজের জীবনের সাফল্য প্রসঙ্গে চাণক্য বলেছেন -

১. নিজ পরিকল্পনা অন্যকে প্রকাশ না করাই শ্রেয়।

২. জীবনে চলার পথে উত্থানপতন থাকবেই - আত্মবিশ্বাস অটুট রেখে, কঠিন সময়ে সাহসের সাথে মোকাবিলা করে এগিয়ে যেতে হবে।

৩.	ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হবে -

মানুষ মাত্রই ভুল হবে - সেটি যেন আবার না হয় সেদিকে দেখা প্রয়োজন।

৪.	মিষ্টভাষী হতে হবে ! নিজের লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে সর্বদা সকলের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা প্রয়োজন।

এখানে বিখ্যাত উক্তি - সত্যম্ বদঃ, প্রিয়ং বদঃ, অর্থাৎ সত্য কথাটি মধুরতার সঙ্গে বলতে হবে।

৫.	There is no short cut to success পথ কিম্বা অনৈতিক পথ ক্ষণিক সুখ দিলেও আসলরূপ উন্মোচিত হলে মানুষের ভবিষ্যৎ নষ্ট হতে পারে।

৬.	যখনের কাজ তখন করা উচিৎ - কাজ ফেলে রাখলে সাফল্য অর্জন করতে দেরীহবে। আবার সময়ের অভাবে তাড়াতাড়ি কাজ করলে তাতে ভুল হবার সম্ভাবনা বাড়ে।

নিজের আত্মসম্মান ও মর্যাদা বজায় রাখার জন্য চাণক্য অনেক কথা বলেছেন এবং কিভাবে মর্যাদা ক্ষুন্ন না করে সফল ও পরিপূর্ণ জীবন যাপন করা যায় সে শিক্ষাও তাঁর নীতি থেকে পাওয়া যায়।

কখনোই অপমান যা বিষপানের থেকে বেশী ক্ষতিকর তা সহ্য করা যাবে না, একথা ঠিক যে হয়তবা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলে বিপদ হতে পারে, সেক্ষেত্রে ক্ষণিক চুপ থেকে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিৎ। নতুবা হতাশা বাড়বে। আমরা প্রখ্যাত দার্শনিক Kant কে বলতে শুনেছি যে নিজেকে এবং অন্য সকলকে treat হিসাবে, (means হিসাবে নয়) treat করতে হবে। এখানেও সেই প্রতিধ্বনি পাওয়া যাচ্ছে।

নিজ আত্মসম্মান রক্ষা করা আমাদের পরম কর্তব্য।

সর্বশেষে বলা যায় যে, একথা অস্বীকার্য যে দুই হাজার বছর আগে রচিত চাণক্যের শিক্ষানীতি/ রাষ্ট্রনীতি/কূটনীতি/অর্থনীতি এছাড়াও নীতিশাস্ত্র আজও কতটা প্রাসঙ্গিক। এসবের মাধ্যমের চাণক্যের দূরদর্শীতার পরিচয় পাওয়া যায়।

অবশ্যই বর্তমান socio - economic political changes মাথায় রেখে রীতিনীতিগুলির সামান্য কিছু হৃদ বদল করা যেতেই পারে।

তবে বিশেষ করে আমার স্নেহের ছাত্রছাত্রীদের প্রতি একান্ত অনুরোধ আমাদের প্রাচ্য চর্চার প্রতি তোমাদের অনুভাগ জন্মাক।

It is not Traditions Vs Modertor but raditions and Modertor instead.

A perfect blending these two night lead us to a spectacular WORLD we all are eagerly waiting to experience sooner the better.

শতরঞ্জ কে খিলাড়ী ও সমকালীন ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

অপরূপ চক্রবর্তী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

হিন্দি ও উর্দু কথা সাহিত্যের অবিস্মরণীয় সৃজনশীল সাহিত্যিক মুন্সী প্রেমচন্দ বা ধনপত রাই শ্রীবাস্তবের এক কালজয়ী সৃষ্টি ছোটগল্প 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ী' (প্রকাশকাল ১৯২৪)। হিন্দি সাহিত্যের এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখক নিছক কল্পনা বা স্বপ্নকে অবলম্বন করে তাঁর সাহিত্য সৃজন করেননি। বরং বাস্তব জীবন রাষ্ট্র ও সমাজের জীবন তরঙ্গ এবং আশা নিরাশাকে বিষয়বস্তু করে সাহিত্য সাধনা করেছিলেন। শতরঞ্জ কে খিলাড়ী হল এমন এক সৃষ্টি যার মধ্যে উনিশ শতকের ভারত ইতিহাসের চিত্র ফুটে উঠেছে।

এই গল্পের প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছে উনিশ শতকে অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলি শাহের আমলের লক্ষ্মৌ নগরীকে কেন্দ্র করে। এই কালপর্ব ভারতবর্ষের ইতিহাসে একযুগ সন্ধিক্ষণ যখন ঔপনিবেশিক ইংরেজ শক্তি নিজেকে এদেশে সর্বপ্রধান করার জন্য বিভিন্ন নীতি ও কৌশল অবলম্বন করে ভারতের নানা রাজ্য অধিকার করে নেয়। এক্ষেত্রে অন্যতম ভূমিকা গ্রহণ করেন ঘোরতর সাম্রাজ্যবাদী বড়লাট লর্ড ডালহৌসী। সত্যজিত রায়ের হিন্দি চলচ্চিত্র 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ী'র প্রথম দৃশ্যে ভাষ্যকার জানিয়েছেন যে ডালহৌসী একের পর এক চেরী (রাজ্য) - পাঞ্জাব, ব্রহ্মদেশ, নাগপুর, সাতারা, ঝাঁসি গ্রাস করে নিয়েছিলেন। একমাত্র অবশিষ্ট ছিল অযোধ্যা। একে ও অধিকার নেয় ইংরেজ শক্তি। ওয়াজেদ আলি শাহকে পদচ্যুত করে অযোধ্যা দখলের কালপর্বকে অবলম্বন করেই শতরঞ্জ কে খিলাড়ী লেখা হয়।

এই ছোট গল্পের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে সমকালীন লক্ষ্মৌ তথা ভারতের ইতিহাস। এই ইতিহাস ব্যাপক অবক্ষয়ের, ভারতের শাসক ও অভিজাত এমন কি আমজনতার অবক্ষয়কে প্রেমচন্দ ব্যঙ্গের কশাঘাতে বিদ্ধ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে তৎকালীন লক্ষ্মৌর সর্বস্তরের মানুষ সংসারের জাগতিক বিষয়কে উপেক্ষা করে বিলাসিতায় বিভোর হয়েছিলেন। একদিকে নবাব অভিজাত উচ্চবর্গীয় মানুষজন একরকম বিলাসিতায় ডুবে ছিলেন অপর দিকে সমাজের নিম্ন শ্রেণীর অন্তর্গত ফকির ভিক্ষু করা আফিমের নেশায় মত্ত হয়ে বিলাসিতা করছিলেন। লেখকের মতে কি আমির, কি ফকির - সবার একই অবস্থা। নবাব আবুল মনসুর মিরাজ মোহম্মদ ওয়াজেদ আলি শাহ (১৮২২-১৮৮৭) অসামান্য কবি ও সংগীতজ্ঞ হওয়ার সাথে সাথে ছিলেন বিলাস ব্যসনে মগ্ন। তাঁর দুর্বার আকর্ষণ ছিল সুরম্য ইমারত এবং সুন্দরী নৃত্যগীত পটীয়সী বাঈজিদের প্রতি। তাঁর প্রাসাদে দিনরাত চলত আমোদ প্রমোদ ও রঙ্গতামাশা। এই শাসক শাসনকার্যে একেবারে মনোযোগী ছিলেন না। ফলে প্রশাসনিক কর্ম ব্যহত হয়। রাজ্যে প্রচন্ড অরাজকতা ও অব্যবস্থা দেখা দেয়। প্রেমচন্দ দেখিয়েছেন কৃষক প্রজাদের ব্যাপক শোষণ চললেও বিলাসিতার কারণে ইংরেজ কোম্পানির কাছে নবাবের ঋণ ছিল ক্রমবর্ধমান। ইংরেজ রেসিডেন্ট এ বিষয়ে নবাবকে সাবধান করলেও কোনো কাজ হয়নি। তাই ইংরেজ শক্তি নবাবকে ক্ষমতা চ্যুত করার

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রেমচন্দ জানিয়েছেন যে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমেই কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। নবাবী শাসনের অবসান ঘটাতে কোম্পানির ফৌজ লক্ষ্মৌর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। কিন্তু ভোগ বিলাসিতায় মগ্ন অভিজাতগণ সে বিষয়ে ছিলেন উদাসীন। গল্পের প্রধান দুই চরিত্র মির্জা সাজ্জাদ আলি ও মীর রোশন আলির মধ্যে এই মানসিকতা সুস্পষ্ট। অলস বিলাসী জীবন যাপনে অভ্যস্ত এই দুই অভিজাত দেশের সংকটকালেও ডুবেছিলেন শতরঞ্জের বাজিতে। এমন কি গৃহগত অশান্তির কারণে তারা বাইরে গোমতী নদীর ধারে নির্জন স্থানে শতরঞ্জের আসর বসিয়েছিলেন। নবাবী প্রশাসন সংকটকালে তাদের সাহায্য চাইলেও তারা তাদের দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হননি। তাদের উদ্দেশ্য ছিল নবাবকে সামরিক সাহায্য না করেই নিজস্ব জায়গীর ভোগ। এইভাবে প্রেমচন্দ সেই সময়কার অভিজাতদের স্বার্থপর মানসিকতাকে তুলে ধরেছেন।

প্রেমচন্দ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে অযোধ্যার শোচনীয় অবস্থাকে উপস্থাপিত করেছেন। ১৮৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইংরেজদের দ্বার অযোধ্যার নবাব ক্ষমতা চ্যুত হন। কিন্তু লক্ষ্মৌর জনগণ ছিল নির্বিকার। কোম্পানির ফৌজ ওয়াজেদকে বন্দী করে নিয়ে গেলেও প্রেমচন্দের মতে শহরের জনজীবনে কোনো চাঞ্চল্য সৃষ্টি হল না। নবাবের শাসনের অবসান ঘটাতে ইংরেজদের কোনো যুদ্ধ করতে হয়নি। তাই প্রেমচন্দ ব্যঙ্গোক্তি করেছেন যে আজ পর্যন্ত কোনো স্বাধীন দেশের রাজার পরাজয় বিনা রক্তপাতে এমন শান্তিপূর্ণ ভাবে, কখনো সংঘটিত হয়নি। এই শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক পালাবদলের অন্যতম কারণ অভিজাতদের কাপুরুষতা, তাই মির্জা ও মীরের ন্যায় অভিজাতরা রাজ্য ও নবাবের কথা বিস্মৃত হয়ে নিজেদের শতরঞ্জের নেশায় মশগুল ছিলেন। এই নেশা এত প্রবল যে খেলায় জয় পরাজয়কে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে প্রচন্ড বাদানুবাদ শুরু হয়। শেষে খেলার অতিতুচ্ছ কারণে তাদের মধ্যে অসিযুদ্ধ শুরু হয় এবং তারা একে অপরকে হত্যা করেন। এইভাবে প্রেমচন্দ তাঁর গল্পের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক অধঃপতনের চরমাবস্থাকে তুলে ধরেছেন। এই অবনতির সময় অযোধ্যার অভিজাতগণ ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার পরিবর্তে তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে আত্মঘাতী দ্বন্দ্ব শুরু করেন। যার পরিণতি রাজ্যের স্বাধীনতার অবসান। সাহিত্যিক প্রেমচন্দ ছিলেন দেশাত্মবোধক ভাব ধারায় উদ্বুদ্ধ। তাই দেশের চরম সংকটকালে জনগণের মধ্যে অনৈক্যের মনোভাবের তিনি তীব্র সমালোচনা করেন। শতরঞ্জ কে খিলাড়ী কাহিনীতে লেখকের এই সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন দেখা যায়।

Nim Sarai Minar: "Unique instance of Muslim sculpture "

Soma Roy
Department of History

The Nim Sara Minar was built at the behest of emperor Akbar. This minar is situated in Malda district and is said to be built around 16th century.The word Nim in Persian means half and this minar is indeed located almost half way between Gaur and Pandua.The Sarai means a place for resting.The minar is called Nim Sarai, because it is situated exactly halfway (Nim) between Gaur-Lakhnauti and Pandua Firuzabad ,and because there was a Sarai(resting place) there.It is located at a spot where the Kalindi river meets the Mahananda river.It is a red watch tower and also an indication tower for travellers coming from far away,and it is likely that at night a chirag was placed on its top for guidance.Built in brick,the minar stands on octogonal platform, each side of which measures 5.50m,and has a circumference of 17.50m.Onece lightening struck the top of the minar around 5.00am.Later the people found that the upper portion had been damaged and one of the spikes had come off.There are spikes carved out of stone to look like elephant tusk and this could have very well been ornamental.

The upper part of the minar fell down long ago,but two lower storeys are still standing and about 18m in height.The storeys are marked by a projecting Corniche round the shaft at about the middle of the height over which is a window to let air and light inside.According to legend the entire outer surface of the minar was studded with elephant tusks.According to some historians the tusks were used for hanging heads of executed criminals as a sign of warning to the pirates and dacoits. A spiral staircase inside the minar leads up to the top.

Nim Sarai Minar is quite similar to the Hiran Minar of Fatehpur Sikri.Akbar built this Hiran Minar.This Hiran Minar is a circular tower covered with stone projection in the form of elephant tasks.Traditionally it was thought to have been erected as a memorial to the emperor Akbar's favourite elephant named Hiran.With a height of 21.34m Hiran Minar is octogonal at ground level . It is also served as light house for travellers.It is designed in a unique manner with its exterior consisting of many tusk like spikes.

Nim Sarai Minar is a unique instance of Muslim sculpture.Later ,the Dutch,French and the British used this place as a centre of trade in silk.In 1656 AD,the first British silk factory came up here.

An Exodus From Believes to Reasons

Dr. KAUSTAV SEN
Dept. of Physics

Technically engrossing world has claimed significantly upon humanity. Technology has taken the world in leaps and bounds towards a state of worldly ecstasy at the same time almost devoiding the human race of basic emotions that truly is the pride of the race itself. One mustn't be surprised to see an infant savvy with a smart-phone even if he is too small to make proper communication. As the virtual world mantels the real one and regions upon the earth, untouched by technology crawls towards extinction, one may find some solace to take a break from the electronic beep, or as much our habits permits and be amid nature, or as much organic is really left of it.

Turning the pages of history and analysing the culmination of the process, it is intriguing to think how very pious our ancestors were. Every social custom, ritual, all the small aesthetics, revolved around some divine phenomena. Sometimes rational, sometimes irrational. Rational or not, they did play as an evident catalyst for human communication and socialization or suffice it to say, they brought people together into real interaction. As those were the days when social media didn't turn people unsocial. Though they didn't have a better understanding of nature or natural phenomena, which led to certain religious customs that eventually turned social, one cannot deny that it was this very ignorance that left our ancestors with better inner radiance that reflected upon their attitude towards nature and their understanding of spirituality. Again this very ignorance turned them respectful towards the unknown that manifested into various and diverse creations that marked the face of the earth with splendid art-forms and creative surges that provided them a way to display their gratitude and obligation towards the "creator". Be it the Aganta-Ellora caves, Leshans giant Buddha, Lord Murugan's statue, Christ the redeemer, the temple of Zeus, the list can go on. Ancient religion has been the process of self-discovery for the human race as an element of nature. Human observation of nature and natural phenomena lead to the formulation of certain laws, which they abided by in order to ensure their better chance for survival. Whereas any unexplained natural occurring would most certainly give rise to myths that propagated and aggregated to form certain believes, which were later termed as "Gods".

History has it that the imaginative human race always had great flair for spirituality. Hence these imaginative mythical “Gods” did gain momentum and so did their flag bearers, who self-proclaimed themselves to have a better understanding of the divine. Their authority was never to be questioned, the ambiguity of their preaching was never to be challenged. The difference of opinion was never to be unleashed. The human race gave in to these propaganda, as thinking was difficult. Thus, these spiritual leaders pondered the human race, with best intentions or not, they managed to divide the world with narrow walls that eventually culminated to fanatics waging war over fiction. Spirituality, which was supposed to be the process of self-discovery, all of a sudden converted into a commercial term, with sacrifice, indulgences and various stupendous procedures available to redeem ones sins. Logic was lost and the very essence of humanism was scavenged in an audacious trail in order to possess the elusive divine. The instance for these are still evident in the modern world.

It was at the wake of science, that certain bright minds around the world had spine enough to challenge this unmindful act of prejudice. It was these very people who broke the mould, enlightening the world in the process. They are the true harbinger of the technological revolution that we witness today. It was they who formulated the path of reasons that the human race was once unconscious of. As science took over, and the orthodoxy to quiet an extent departed, the human kind was finally able to shake off the shackles of “Dead old habits” and see a new horizon full of promises. The promise of better understanding, of better reasoning, altogether a promise of better future. But should spiritually be done away with? Certainly not. Spirituality is the path to inner peace. It is tremendously essential to bridge the void between reasons and believes. Spirituality is the one that would help us understand the boons of science and implement them better, in a more humanitarian way. Humans must optimize both and hit the sweet spot between science and spirituality. Synonymous to the way nature created us, with equal amount of reason and imagination as depicted in the bi-lobed brain. This altogether would make humans eminently creative species, with elevated consciousness and immense potential.

এক রাতের গল্প / পুনর্জন্ম

নাছরিনা পারভীন, (ইতিহাস অনার্স) সেমিস্টার - ৬, রোল - ২২৩

বেড়ানো একটা অ্যাডভেঞ্চার। ঘুরতে আমার খুব ভালো লাগে। এক এক অ্যাডভেঞ্চার এর মুখোমুখি হই। সেদিন গেলাম মানিকতলা, সবুজ পাহাড়-নদী যা আমাকে টানে বেশি।

বাস যখন মানিকতলা বাসস্ট্যান্ডে এসে দাঁড়াল তখন বেলা গড়িয়েছে অনেকটা। বাসস্ট্যান্ডে নেমে কোনো লোকজন চোখে পড়লো না। শুধু ধু ধু প্রান্তর ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়লো না। মনিষা আমাকে বার বার বারণ করেছিন। "প্রবীর লাস্ট সেমিস্টার চলে এলো এবারতো একটু পড়। আর কত ঘুরবি? এবার রেজাল্ট খারাপ হলে কাকু বলেছেন তোকে বাড়ি থেকে বার করে দেবেন।" আর কি করবো বল মনিষা? ঘুরতে যে আমার খুব ভালো লাগে। আমার এখন মাথায় শুধু মানিকতলা ছাড়া কিছু আসছে না। দেখ দেখ কত সুন্দর জায়গা ফোনটা নিয়ে দেখালাম। মনিষা আমার ছোটবেলার বান্ধবী, ও আমাকে সব কিছুতে হেল্প করে। আমি আবার একটু খামখেয়ালী, যদিও ওর কথাগুলো সত্যি, তা আমি এখানে এসে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। ফোনটা বার করে গুগল ম্যাপটা দেখছিলাম হঠাৎ কোথা থেকে একটা ছেলে এসে জিজ্ঞাসা করলো - 'কোনো সমস্যা দাদা?' আমি তাকিয়ে দেখলাম ছোকরা ছেলে। জিজ্ঞাসা করলাম - 'এখানে কি নেটওয়ার্কের সমস্যা?' সে মাথা চুলকিয়ে বললো কই দেখি। আমার হাত থেকে ফোনটা নিয়ে নাড়াচড়া করে দেখতে দেখতেই ফোন নিয়ে দৌড় মারলো। আমিও ছুটলাম তার পিছনে, সে যতো দৌড়াতে লাগলো আমিও ছুটতে লাগলাম তার পিছনে। ছুটতে ছুটতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। থামতেই দেখলাম চারিপাশটা কেমন গুমোট নিঝুম, সামনে তাকিয়ে দেখলাম একটা ভগ্নপ্রায় প্রাসাদ। এদিক-ওদিক তাকিয়ে ফোনটা খুঁজতে লাগলাম। ওটা কি আর পাওয়া যাবে। ওই ফোনটাতে সব ইম্পর্ট্যান্ট ডকুমেন্টস্ আছে, কি হবে কি করবো ভাবছিলাম। হঠাৎ দেখলাম ছেলেটির প্রাসাদের মধ্যে দিয়ে ছুটতে ছুটতে আমার দিকেই আসছে। ফোন কই আমার? জানিনা, পালান এখান থেকে পালান, বলেই ছুটলো। আমি হতবাক! সামনের ঝোপে তাকাতেই দেখি কিছু একটা পড়ে আছে। তুলতে যাবো তখন কারো পায়ের আওয়াজে উঠে দাঁড়ালাম। সামনে তাকাতেই আমি অবাক। মনিষা! তু-তুই এখানে? কি করে এলি? আর এখানেই বা কি এলি? আর এ সব কি পরেছিস, গহনা, শাড়ি? উত্তরে সে শুধু হাসলো। মনিষা তো কলকাতা। তবে?

ওর হাসির পাশাপাশি ঝোপের মধ্যে আমার ফোনটা বেজে উঠলো। তবে চোরটা এখানে আমার ফোনটা ফেলে ফালতু আমাকে ভয় দেখিয়ে গেলো। ফোনটা তুলতেই গাটা ছমছম করে উঠলো - মনিষা ইজ কলিং। এটা কিভাবে সম্ভব! ভাবতেই চারিদিকে ভালোভাবে তাকিয়ে দেখি কেউ নেই। ভয়ে ভয়ে ফোনটা তুললাম - ও পাশ থেকে বললো কিরে ঠিক করে পৌঁছালি। তুই এখন কোথায় রে মনিষা? কোথায় আবার থাকবো? বাড়িতে। মনিষা যদি কলকাতা থাকে তবে আমার সামনে কে ছিল! মনিষা রাখ আমি পরে কথা বলছি, ফোনটা রাখতেই অফ হয়ে গেল ফোনটা।

জঙ্গল থেকে বের হতে যাবো দেখলাম পাশে লাইট জ্বলছে। এই গভীর জঙ্গলে লাইট কোথা থেকে এলো। ভালো করে দেখলাম ওগুলো ল্যাম্পপোস্ট। ফিরে হাঁটতে যাবো তখন কানে এলো গাড়ির আওয়াজ, তাও আবার মোটরগাড়ি, তাকিয়ে দেখলাম সেকালের মোটরগাড়ি। ওই দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে হাঁটতে লাগলাম। কিন্তু গাড়ি আমার পিছু ছাড়ছে না। আমি রীতিমত দৌড়াতে লাগলাম, গাড়ির আওয়াজও বাড়তে লাগলো। এইভাবে আর কতক্ষণ দৌঁড়াবো ভেবে দাঁড়িয়ে পড়লাম। গাড়িও আমার সাথে সাথে থেমে গেল। বললাম - কি চাই? কোনো উত্তর এলো না। ফিরে আবার হাঁটতে যাবো তখন গাড়ি থেকে একজন বার হতে হতে বললো পালাতে পারবে না। বিপদে পড়বে আমার গাড়িতে ওঠ।' তার দিকে তাকিয়েই আমার সারা শরীরে শিহরণ বয়ে গেল। অবিকল আমার মত দেখতে পা থেকে মাথা অবধি কোনো কিছু বাদ নেই শুধু পোশাকটাই আলাদা। আমি ভয়ে ভয়ে বললাম কে আপনি? সে শুধুই বললো গাড়িতে ওঠ। আমি ভয়ে দৌড় মারলাম। গাড়ি আবার চলতে শুরু করলো কিন্তু আর থামলো না, পাশ কাটিয়ে চলে গেল। আমি চলে গেলাম। আশপাশ দেখতেই দেখলাম আমার ঠিক পিছনে সেই কিছুক্ষণ আগের ভগ্নপ্রায় প্রাসাদটি দেখেছিলাম সেটি এখন সুসজ্জিত ইমারত। অবাকের উপর অবাক হচ্ছি! ঠিক তখনই প্রাসাদের মধ্য দিয়ে আওয়াজ এলো প্রবীর বাবা, প্রবীর বাবা ....

আমার সারা শরীর হিম শীতল হয়ে গেল। এই ডাকটি শোনার জন্য কতদিন আশায় বসে ছিলাম। ইনিতো আমার স্বর্গীয় মা। ভাবতেই দেখলাম আবার গাড়ির শব্দ। মাকে নিয়ে চলে যাচ্ছে কারা। মা বলছে - 'বাবা আমায় বাঁচা আমায় ওই শয়তান গুলো মেরে ফেলবে'। গাড়িটি অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে। আমি ছুটতে লাগলাম মা মা বলে। ছুটতে ছুটতে একটা বট গাছের শিকড়ে পা আটকে পড়লাম। পিছনে থেকে একজন বিভৎস চেহারা মানুষ বেরিয়ে এলো, চোখগুলো কি বাজে দেখতে। আমি বললাম কে আপনি? সে আমার দিকে এগিয়ে আসতে আসতো বললো - কতদিন ধৈর্য ধরেছি এই দিনের আশায় তোকে চাই। দূর থেকে মায়ের গলার আওয়াজ শোনা গেল - প্রবীরবাবা পালা, পালা বাবা পালা। আমি উঠে আবার ছুটতে ছুটতে জঙ্গলের বাইরে আসতে দেখলাম একটা বাড়িতে বাইরে টিমটিমে আলো জ্বলছে। সেই অভিশপ্ত রাতটা ওই বাড়িতে কাটালাম।

পুরো ঘটনাকে একটি দুঃস্বপ্ন ভেবে কাটাতে চাইলাম কিন্তু পারলাম না। সকাল হতে সেই গ্রামের লাইব্রেরিতে ঢুকতেই একজন মধ্যবয়স্ক মহিলা আমার পথ আটকে দাঁড়ালো। একটু দাঁড়ানতো আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি বলে টানতে টানতে আমাকে পুরানো বইয়ের তাকের সামনে নিয়ে গেল। খুঁজে খুঁজে আমার হাতে একটা বই দিল। পাতা ওল্টাতেই দেখি আমার মত অবিকল একটা 'রাজ পোশাক পরিহিত পুরুষ।' তিনি বলতে শুরু করলেন - ইনি মহারাজ মানিকরাজ। এ অনেক আগের কথা। পরের পাতা ওল্টালেই দেখি আমার স্বর্গীয় মায়ের ছবি। রাজমাতা নিরা দেবী। মহারাজের মাতা এবং মহারাজ সবকিছু থেকে অবহেলিত। কিন্তু এনারাই প্রজাদের দুঃখ-কষ্ট বুঝতো। মানুষের মুখে এনাদের এত নাম দেখে, একসময় মহারাজার কাকার এই সব চোখে লাগে।

তারপর একদিন রাতে ষড়যন্ত্র করে মহারাজ ও রাজমাতা এবং মহারাজার 'পরিণীতা'কে হত্যা করে সিহাংসনে বসেন কাকা। সবাই বলে জঙ্গলের আশে পাশে নাকি তাদের দেহ পুঁতে দেওয়া আছে। আমি বিস্ময় কাটিয়ে লাস্ট পাতা খুলতেই মনিষার ছবি। তবে কাল যে ঘটনা ঘটলো সেটা সত্যিই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ফোনটা বেজে উঠলো, ফোন স্ক্রিনে মনিষা is calling ....

সত্যিই কি ভূত !

সাহিনা খান, (ইংরাজী অনার্স) সেমিস্টার - ৪, রোল - ২০১

স্কুলে যারা একটু পড়াশোনা করে তাদের কদর একটু বেশিই, সে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছেই হোক বা ক্লাসের অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীর কাছে। আমাদের ক্লাসে ও এইরকম ভালো মেয়ের সংখ্যা ছিল প্রায় পনেরো-কুড়ি জন। তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। তাই আমাদের খুশি রাখার জন্য কেউ কেউ নানা রকম উপহার দিত। এই রকমই একদিন একটি মেয়ে সকলকে তাদের বাগান থেকে তোলা টাটকা গোলাপ দিয়েছিল। আমরা প্রত্যেকেই খুব খুশি তরতাজা লাল গোলাপ পেয়ে। কিন্তু সেদিনই ঘটে গেল এক আশ্চর্য ঘটনা। ঘটনাটি ঘটে টিফিনের শেষ ঘন্টা পড়ার পর। আমরা তিনতলাতে বসতাম। হঠাৎ শুনলাম ক্লাস ফাইভের শেষ বেঞ্চে বসা এক ছাত্রী নাকি কাঁদছে। সে স্পষ্ট করে কিছু বলছে না, তবে যা বলছে তাতে মনে হয় সে অস্বাভাবিক কিছু শুনেছে - একটা বিকট চিৎকার, যা আর কারো কানে যায় নি। আমাদের তো একথা শুনে জ্ঞান হারাবার জোগাড়। ভূত নাকি ! তিনতলা থেকে নীচে নামার কথা কেউ মুখেও উচ্চারণ করল না, ফলে নীচে কি হচ্ছে তা দেখতে পাওয়া গেল না। আমার মাথায় তখন ঘুরছে অন্য কথা, যেহেতু আমরা ঘটনাটাকে ভৌতিক বলেই ধরে নিয়েছি, তখন আরো একটা কথা ভাবা দরকার। ভূতেরা তো বর্ণ, গন্ধ এসবেই আকৃষ্ট হয়। আর আমাদের ব্যাগে রয়েছে সুগন্ধ যুক্ত রক্ত গোলাপ, আর তার কিছু মাত্র যদি ভূত টের পায় তাহলেই সর্বনাশ। তিনতলা তার কাছে তিন পায়ের সমান হবে আর সে চলে আসবে আমাদের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে সব কথা খুলে বললাম আর তারাও আমার সাথে একমত হয়ে গোলাপ ছুড়ে ফেলল তিনতলার জানালা দিয়ে একেবারে নীচে। তারপরেই ক্লাসে জীবন বিজ্ঞানের শিক্ষিকা ঢুকলেন। তাঁর কাছ থেকে পুরো ঘটনাটা খুলে জানতে চাইলে তিনি যা বললেন তাতে সকলেই একটু আশ্বস্ত হয়েছিল। আমরা সবাই ভুলে গেছিলাম সে আমাদের স্কুলের পিছনে বেশ বড়ো একটি হাসপাতাল আছে। সেখানে দিনরাত কাজ চলে। তাই নানা রকম আওয়াজ হওয়াটাই স্বাভাবিক। সেদিকে কারো খেয়াল থাকে কারো থাকে না। এই ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে বলতেই পঁয়ত্রিশ মিনিট কেটে গেল। ম্যাডাম চলে গেলেন। আমরা বুঝলাম বাচ্চা মেয়েটি কী শুনতে কী শুনে ভয় পেয়েছে। সবাই চুপচাপ বসে, হঠাৎ শুনলাম কে যেন বলছে - যাহঃ, গোলাপ গুলো তাহলে ফালতু কারণে জলে গেল! একথা শুনে যারা ভালো যুক্তি দেওয়ার জন্য আমাকে মাথায় করে রাখছিল তারাই খুঁজতে লাগল যে, কে গোলাপ গুলো ফেলার কথা বলেছিল। আমায় তখন পায় কে। আমি চুপ করে ব্যাগের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে বেঞ্চে বসে রইলাম। পরক্ষণেই সকলের চোখ পড়ল আমার উপর, আর তারা আমার উপর চিৎকার শুরু করল। আমার মাথায় আবার একটু কুবুদ্ধি খেলে গেল। সকলকে মেজাজ দেখিয়ে বললাম, ''বেশতো সকলে আমাকে দোষ দিচ্ছিস, প্রমাণ কী যে ম্যাডাম যা বললেন তা সত্যি! হতেও তো পারে তিনি মিথ্যে বলছেন যাতে আমরা ভয় না পাই, সকলে স্কুলে আসি। হতেও তো পারে ভূতকে আকৃষ্ট করার মতো কিছু ছিল না বলেই সে আর দেখা দেয় নি। হতে পারে না কি?'' এক নিঃশ্বাসে এতগুলো কথা বলে যখন থামলাম দেখলাম সকলেই প্রায় দমে গেছে। বুঝলাম তাদের মনে কথাগুলো দাগ কেটেছে। আমি হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। আর জীবনে কাউকে জ্ঞান দিতে যাব না। যাইহোক, আমার কাছে এই ঘটনা কিছুটা হাস্যকর, কিছুটা রহস্যময় রয়ে গেছে। এখন তোমাদের কাছে সমস্ত কাহিনি খুলে বললাম, তোমরাই এই কাহিনির সত্যতা যাচাই কর।

বলতে না পারা কিছু কথা

ইমরান মোল্যা, (বি.এ অনার্স) সেমিস্টার - ২, রোল - ৩২১

তখন আমি ছোটো ছিলাম। প্রেম-ভালবাসা যে দারুণ একটা ব্যাপার, এ ব্যাপারে একেবারে অবুঝ ছিলাম তাও নয়। তবে প্রেম-ভালবাসার যে অনুভূতি, তা কী রকম, এ সম্পর্কে কোনো সু-স্পষ্ট ধারণা তখন ছিল না। তখন শৈশবকাল বয়সটা ততটাও পরিপক্ক হয়ে ওঠেনি। বয়ঃসন্ধি বা কিশোরকালকে কেনো ঝড়ঝঞ্ঝার কাল বলা হয় তা কেবল বইতে পড়েছিলাম। ঝড়-ঞ্ঝার অনুভূতি যে কতটা তীব্র তা আর একটু বড় হলেই জানতে পারব।

একটা কথা মাঝে-মাঝে বেশ মনে পড়ে। সেই ছেলেবেলায় একদিন রাতে বিছানায় শুয়ে পড়ে আমার মাসি আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল ''আমার খোকা ক্লাস 8 বা 9 -এ উঠে প্রেম-ভালোবাসা করবে না, বড় হয়ে কলেজে উঠে প্রেম-ভালোবাসা করবে।'' তখন আমি স্বাভাবিক ভাবে বড় মুখ 'হ্যাঁ' বলেছিলাম।

যতদিন যায় স্মৃতিটার বয়সও তত বেড়ে চলেছে। বাল্যকালকে পিছনে ফেলে কিভাবে যে কৈশোর কালের দিকে এগোচ্ছি তার বোধ যেন একটু একটু করে সজাগ হয়ে উঠছে। আমার মাসির বিয়ে হয়ে গিয়েছে। তাই আর মামার বাড়িতে থাকি না। ওখান থেকে চলে এসছি। ও নতুন স্কুলে ক্লাস সেভেন-এ ভর্তি হয়েছি। এই জীবনে দ্বিতীয়বার B সেকশান্ ভর্তি হয়েছি।

এই ক্লাসের সব ছেলে-মেয়েদের সাথে আমার খুব ভাব হয়েছে। তাদের সাথে খেলাধূলায়, আনন্দে সারা ক্লাস মেতে থাকে। স্যার-ম্যামরা বুঝতে পারল যে, তাদের স্কুলে একটা ছেলে এসছে। না না ! খারাপ নয় ! ভালো ছেলে, লেখাপড়ায় খুব ভালো। তবে ক্লাসে অন্যান্য যে সমস্ত ছেলেরা বদমায়েশি করে তাদের সাথে এর তফাৎ খোঁজাটা মুশকিল।

আমার যমজ ভাই A সেকশানে পড়ে। ওই ক্লাসের সবাই আমাকে মোটামুটি চেনে যে আমি নাকি ভালো লেখাপড়া করি। ওই ক্লাসের শেষে সারির তিন-চারটে ছেলেদের সাথে আমার ভাব হতে লাগল। তারপর খুব ভালো বন্ধুত্ব। ওদের মুখে আমি সামনের সারির কয়েকজন ছেলেমেয়েদের নাও জানতে পেরেছি।

এর পরের বছর ক্লাসে তৃতীয় স্থান অধিকার করে ক্লাস VIII-এ উঠলাম। লেখাপড়ার খাতিরে প্রথম সারির কয়েকজনের সাথে বেশ ভালোরকম বন্ধুত্ব হল। ওদের মধ্যে অবশ্য দু-একজন আমাকে খু ঈর্ষা করত। আর মেয়েরা। ওরা তো আমাকে মোটেই দেখতে পারত না। ওদের মধ্যে এই ধারণা জন্মায় যে আমি নাকি মেয়েদের উপর খুব রাগ কারণ ক্লাসে যেসব ছেলেরা মেয়েদের সাথে সবসময় আড্ডা দিত আমি তাদের বারণ করতাম তাই হয় তো সবাই আমার প্রতি এরকম বিরূপ ধারণা পোষণ করত।

প্রথম দুদিন স্কুল গিয়ে ভাবতাল দেখে বছরের শুরুতে প্রথম ১ মাস স্কুলে যাইনি। রীতিমতো রুটিন মাফিক ক্লাস শুরু হওয়ার পর স্কুলে গিয়েই এই প্রথম একটা মেয়েকে দেখি। না মানে এর আগেও মেয়ে দেখিনি তা নয়, তবে এ দেখা আর সে দেখার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে। তা বেশ অনুভূত হচ্ছে। মেয়েটির নাম হল ইমন। ১-১০ এর মধ্যে রোল। দেখতে মোটামুটি সুন্দরী। তবে এই যেন আমার কাছে সবচেয়ে সুন্দরী। এরপর থেকে রোজ মেয়েটিকে দেখতাম সময় পেলেই দু-চোখ ভরে দেখতাম।

ক্লাসের অন্যান্য মেয়েদের মতো ইমনের সাথে আমার টুকটাক কথাবার্তা হত। তবে ওকে নিয়ে আমার যে এই অনুভূতি তা কখনো ওকে বলতে পারিনি বা বলার চেষ্টাও করিনি। আমার ব্যাকবেঞ্চার বন্ধুগুলি যারা আমার সত্যিকারের বন্ধু তাদের সাথেও আমি ইমনের কথা লজ্জায় বলতে পারিনি। ওদের মুখে শুনলাম যে, ইমন নাকি একটা অন্য ছেলের সাথে প্রেম করে সম্পর্কে ওর গ্রামের ভাই ময়ূর।

এইভাবে দেখতে দেখতে ১ বছর পার হয়ে গেল। পরের বছর অর্থাৎ ক্লাস IX এ ইমন আমাদের গ্রামে একটা মাস্টারের কাছে টিউশানি পড়তে লাগল। যেখানে আমার ভাই ক্লাস VI অবধি পড়েছিল। খবর পেয়েই আমি আগে টিউশান বাদ দিয়ে এখানে ভর্তি হয়ে যাই।

এবার ওকে দেখার আর বেশি সময় পেলাম। টিউশনে ইমনের থেকেও সুন্দরী মেয়েরা পড়ত। কিন্তু আমার মনে ওর জায়গা কেউ কোনো দিন নিতে পারবে না। ইমনের মধ্যে কী তখন আছে যে প্রথম দেখাতেই আমি ওর প্রতি মন্তমুগ্ধ হয়ে পড়ি। কেন ইমনকে নয়ন ভরে দেখার জন্য ততটা উদ্‌গীব হয়ে থাকি। ইমন কীভাবে আমার মনে ওর নাম গেঁথে দিয়েছে এসবের উত্তর আমি জানি না। আর খুঁজতে চাই না। আমি শুধু চাই ইমনকে প্রতিটি ক্ষণের জন্য এবং সারা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের জন্য।

ময়ূর মাঝে মধ্যে ইমনের সাথে স্কুলের বাইরে দেখা করতে আসত। তাতে আমার কোনো মাথা ব্যাথা নেই। সত্যি বলতে কী ! আমি ক্লাস VII-এ যেখানে টিউশান পড়তে যেতাম সেখানে প্রথম একটা মেয়ের খপ্পরে পড়েছিলাম। মেয়েটার নজর আমার টাকার উপর আর তখন সবে বয়ঃসন্ধিতে পা দিচ্ছি। বয়সের ঢেউ-এ দুজনের শরীর বেশ ভালোরকম ভিজলেও আমার মনে ওই মেয়েটার জন্য কোনো জায়গা ছিল না। মেয়েটির চরিত্রহীনতা বুঝতে পেরে নিজেকে সংযত করে নিয়েছিলাম।

তবুও আমি মাঝে মধ্যে ইয়ার্কির ছলে ইমন আর ময়ূরের সম্পর্কের কথা জানতে চাইলে ইমন বলত, ‘‘ও আমার গ্রামের একটা ভাই, এর থেকে বেশি কিছু না’’ আমি অগত্যা একটু হেসে দিতাম।

আমার পাশের গ্রামেই ইমনের বাড়ি। আবার ওই গ্রামে আমার একবন্ধু সাইনের বাড়ি। ইমন এর বাড়ি আর মামার বাড়ি তায় এক জায়গায়। এসবই আমি জানতাম। একবার সাইনকে নিয়ে আমি ইমনের মামার বাড়ি একটা নোটিশ দিতে যাই। ইমনের বাড়ি চিনলেও আমি ওখানে যাইনি কারণ ওই আমাকে নোটিশটা ওর মামার বাড়িতে দিয়ে আসতে বলেছিল। ফেরার পথে ইমনদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে আমি ওকে এক ঝলক দেখতে পাই। তখন ও দৌড়ে ঘরে ঢুকছিল। পরনে ছিল আকাশ-নীল রঙের কাপড়। কী সুন্দর যেন পরী। এরপর থেকে কোথাও ঘুরতে গেলেই আমি ওদের গ্রামের উপর দিয়ে যেতাম।

এদিকে ক্লাসের মেয়েদের সাথে আমার বিরোধ দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। আমিও তো মেয়েদের সাথে কথা বলি তাই বলে গল্প করারও তো একটা সীমা আছে। ক্লাসে সবার মুখ ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে হওয়া উচিত। কিন্তু কয়েকটার ছেলের ব্ল্যাকবোর্ড সারাক্ষণ মেয়েদের দিকে থাকে। ওই নিয়ে একবার স্যার-ম্যামদের সাথে আমার তুমুল ঝাগড়া হয়েছিল। কেউ তাকে সাপোর্ট করেনি। সামনের সারির বন্ধুরা শুধু বসে বলে মজা নিয়েছিল। স্যার-ম্যামরা খুব বকে ছিল।

ক্লাসের মেয়েরা তো খুব খুশি। সেদিন আমি খুব দুঃখ ও হতাশ হয়ে পড়েছিলাম এবং পরে স্যার-ম্যামদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলাম। এরপর তবুও আমি আমার বন্ধুদের সাথে আনন্দে মেতে থাকি। ইমনের কথা আমাকে অনেক বললেও আমি লজ্জায় ইমনের প্রতি আমার ভালোবাসার কথা বারে বারে অস্বীকার করে যাই।

ইমন নিজের অজান্তে আমার মনে যে কী ঝড় তুলছে তা যেন আমার পক্ষে সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। খেতে, পড়তে, বেড়াতে শুধু ইমনের কথাই মনে পড়ে। রাতে ঘুমের সময় স্বপ্ন-এর মধ্যে কতবার যে ও উঁকি মেরে চলে যায় তার ঠিক নেই। কোনো মেয়ের সাথে কথা বললেই ওর মায়াবী মুখটাই ভেসে ওঠে। ওর প্রতি ভালোবাসার ততটা গভীরে চলে যাচ্ছি যে মনে মনে ভাবি বড় হয়ে ইমনকে বিয়ের প্রস্তাব দেব।

এইভাবে চলতে চলতে ক্লাস-X-এ উঠে গেলাম এবং ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকার করলাম। ফাস্ট বয় হওয়ার কোনো বৈশিষ্ট্য আমার মধ্যে ছিল না বরং তার উল্টোটাই আমার মধ্যে দেখা যেত। যাই হোক রেজাল্ট আউট-এর দিনে মাইকে আমার প্রথম স্থান অধিকার করার কথা ঘোষণা হলে আমার আনন্দ পাওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তার বদলে দুঃখটাই পেলাম। কারণ ক্লাস VII -এ থাকতে যখন আমার রেজাল্ট আউট হয় এবং মাইকে আমার নাম ঘোষণা করলে B সেক্শানের ছেলেমেয়েরা প্রত্যেকেই উল্লাসিত হয়ে জোরে জোরে করতালি দিয়ে আমাকে অভিবাদন জানিয়ে ছিল। কিন্তু আজ যেন প্রত্যেকের অবস্থা বিরূপ ছিল। এরা আমার সাথে এমন ব্যবহার কেন করে তা আমি জানি না। সত্যিই কী এই ক্লাসের মেয়েদের সাথে আমার ভারত-পাক সম্পর্ক।

এদিকে ইমনের মনে তো অন্য কারও স্থান। তবুও ওর প্রতি আমার যে একটা ভালোবাসা থাকতে পারে সেটা সম্পর্কে ইমনের কোনো ধারণাই নেই। তাছাড়া আমি কখনোই আমার ভাব-ভঙ্গির মাধ্যমে ইমনকে আমার মনের কথা জানানোর চেষ্টাও করিনি। ইমন আমার মনে বয়ঃসন্ধিকালের যে দুর্যোগ সৃষ্টি করেছিল, তা ধীরে ধীরে যেন বিপর্যয়ে পরিণত হচ্ছে। ছেলেবেলায় মাসিকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা মনে পড়লে হাসি পায় এবং মাসির উপদেশের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরে ওঠে। না এভাবে আর চলতে দেওয়া যায় না ইমনের কথা এখনো পর্যন্ত আমি কাউকে বলিনি। তাই যেন মনে মনে আরও বেশি কষ্ট পাই।

ইমনকে কোনো দিন পাবো না জেনে ওকে মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করছি কিন্তু পারছি না। না এবার মনের কথা প্রকাশ করার সময় এসেছে। ইমনকে না কখনোই না। আমি সব কথা সাইনকে খুলে বলি। এবার যেন মনটা একটু হালকা হল।

বন্ধুরা গল্প করে স্কুল লাইফের ভালবাসা কোনোদিন টেকে না। আসলে ওটা বয়ঃসন্ধির প্রভাব। ওটা ভালবাসা নয় বরং ভালালাগা। ইংলিশ ম্যাম মাঝে মধ্যে এ বিষয়ে বক্তব্যে রাখে, ''আমাদের জীবনে স্কুল লাইফের মতো পরবর্তী স্টেজ গুলিতে আরও অনেককে ভালো লাগতে পারে কিন্তু ভালবাসার স্থান কেবল একজনই নিতে পারে।'' আমিও এতে সায় দেই এবং গভীরভাবে এই কথা গুলি বিশ্বাস করতে চাই। ইমনের প্রতি আমার ভালোবাসাকে ভালোলাগা ভাবতে চাই কিন্তু পারি না।

এই ভাবে দেখতে দেখতে মাধ্যমিক পরীক্ষাও হয়ে গেল। ছুটি পড়ে গেছে আর ইমনকে দেখতে পাই না। ওদের গ্রামের উপর দিয়ে গেলেও দেখা হয় না। এদিকে আর এক সমস্যা পরীক্ষায় মোটামুটি ভালো রেজাল্ট করেছি ওটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় টার্নিং পয়েন্ট। আমার বাড়ির লোক, স্কুলের স্যার-ম্যাম, টিউশান টিচাররেরা এমনতি ব্যাকবেঞ্চার বন্ধুগুলো সকলেই আমাকে সাইন্স নিয়ে পড়তে বলেছে। কিন্তু আমি আর্টস নিয়েই পড়তে চাই এবং সকলের বিরুদ্ধে গিয়ে আর্টস নিয়ে একই টিউশানে একই স্কুলে ভর্তি হয়েছি। কেবলমাত্র ইমনের মুখখানি শেষ দুবছরের জন্য একটু ভালো করে দেখব বলে।

ইমনের প্রতি আমার ভালোবাসা একতরফা, সত্যি এবং পবিত্র। ইমন আমাকে নাই ভালোবাসুক তবুও আমার ভালোবাসার কথা ইমন কী কোনো দিনই জানতে পারবে না। তবে কী আমার ভালোবাসা মূল্যহীন।

একদিন আমার মামাতো ভাইয়ের সাথে সব কথা খুলে বললাম। আরও অনেক কথা হল মনের ভিতর অনেক সাহস পেলাম।

ইমনের থেকে আমি কিছু চাই না। কেবল ইমনের প্রতি আমার ভালোবাসার কথা জানাতে চাই। জানাতে চাই কীভাবে ইমন নিজের অজান্তে আমার মনকে ভেঙেছে কাঁদিয়েছে। নইলে আমি শান্তি পাব না। কিন্তু নিজে মুখে আমি ইমনকে কখনোই এসব কথা বলতে পারব না। অন্য কাউকে দিয়ে বলাব তাও এমনভাবে প্রসঙ্গ থাকবে আমাকে নিয়ে অথচ ইমন কোনোদিনই জানতে পারবে না যে আমিই তাকে কথাগুলো বলতে বলেছি।

সাইন সব ব্যাপারটা জানে তাই ওকে দিয়েই আমার মনের কথা গুলি ইমনের কাছে জানান দেব। সাইনকে কথাগুলো এমন ভাবে বলতে হবে যে তার নিজের প্রয়োজনে ইমনকে কথা গুলি বলছে। অনেক ভেবে উপায় বার করে সাইনকে সব শিখিয়ে দিলাম।

সাইন ইমনের সাথে দেখা করে বলবে ''আমার বন্ধু মনে মনে তোকে অনেক ভালোবাসে সেই ক্লাস VIII থেকে। তোকে প্রথম দেকার পর থেকেই ক্লাসে ডেলি প্রেজেন্ট থাকত শুধু তোকে দেখার জন্য। তুই যখন IX-এ ওদের ওখানে পড়তে যাস শুধু তোর জন্যই আমার বন্ধু ওখানে পড়তে যায়। ও তোকে ততটাই ভালোবেসে ফেলে যে, তোর আর ময়ূরের কথা জানা সত্ত্বেও তোকে জীবনসঙ্গী করার স্বপ্ন দেখে। হ্যাঁ তোকে বড় হয়ে বিয়ের প্রস্তাব দেবে ভেবেছিল। সত্যি! ভালোবাসা অন্ধ হয়। কিন্তু সেটা আর কোনো দিনই সম্ভব হবে না। তার কারণও আমি ওর কাছ থেকে জানতে চাইনি। ভালো রেজাল্ট করা সত্ত্বেও সাইন্স না নিয়ে আর্টস নিয়ে পড়ছে শুধুমাত্র তোকে শেষ দু-বছর দেখার জন্য, একই স্কুলে, একই টিউশানে পড়ছে।

এসব কথা আনি চাড়া ওর অন্য কোনো বন্ধু জানে না। আর কাউকে ও জানাতেও চায় না। কারণ এসব কিছু আমার বন্ধু ভুলতে চায়। কিন্তু মনের বোঝাকে কমানোর জন্য কাউকে না কাউকে দুঃখের কথা বলতে হয় আর সেই একজন হলাম আমি।

এসব কথা কিন্তু আমার বন্ধু তোকে বলতে ও বলিনি। বা আমিও ওর কষ্ট কমানোর জন্য তোর কাছে আসেনি। আমি এসেছি আমার প্রয়োজনে ও আর্টস নিয়ে পড়ায় আমাদের একটু সুবিধা হচ্ছে। লেখাপড়ায় ওইই আমাদের ভরসা। কিন্তু তুই তো আর ওদের ওখানে টিউশানে পড়তে যাস না স্কুলও ঠিকঠাক বসে না। তোর জন্য ও এক কিছু করেছে শুধু তোকে দেখার জন্য বেচারার ভাগ্য সেটাও নেই।

তারপর হল আসল কথা, সেটা আরও ভালো করে সাইন বুঝিয়ে দিলাম। এই কথাগুলি খুবই যৌক্তিকতার সাথে সাইন ইমন-এর সামনে বলতে থাকবে, ''...তাই আর আর্টস নিয়ে পড়ার কোনো মানে নেই। ও সাইন্স নিতে চায় তাহলে আমাদের কী হবে। আমরাই একরকম ওকে আর্টস নিয়ে পড়ার জন্য পেড়াপীড়ি করেছিলাম।''

এরপর শেষে সাইন ইমনের কাছে অনুরোধ করবে যে, ইমন যেন আমাকে এসে বলে যে আমি অন্যান্যদের মতো ভালো নাম্বার পেয়েও আর্টস নিয়ে পড়ছি এতে আমি (ইমন) খুব খুশি হয়েছি।

''এটুকু বললেই কাজ হয়ে যাবে। এবার তুই বলতে পারিস যে আমার বন্ধু তোর কথা শুনবে কেন। আমি জানি ও তোর কথা শুনবে, একশোবার শুনবে। এতটুকু বলার পর শেষে সাইন একটু সাবধান করে দেব, 'আর দয়া করে এসব কথা ওকে বা অন্য কাউকে বলিস না। আমার বন্ধু যদি কোনো ভাবে জানতে পারে তাহলে আমার আর ওর বন্ধুত্বের বিশ্বাসটা ভেঙে যাবে।'

ব্যাস ! এতটুকু বললেই যথেষ্ট হবে। তা ইমন এসে আমাকে কী বলল বা না বলল তাতে কোনো যায় আসে না। ইমন আমার মনে ওর প্রতি ভালোবাসার কথা জানতে পারবে অথচ আমি সরাসরি কিছুই বলব না।

যাইহোক সাইন কথাগুলি পরপর সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে ইমনকে বলবে কিন্তু ১ মাস হয়ে গেল কিছু বলল না। আর দু-দিন পরে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার Registration এই দুদিনের মধ্যে Reg. এর আগে সাইনকে ইমনের সাথে কথাগুলো বলতে হবে। কারণ আমি এমনিতে আর্টসে Reg. করব। আমি ইমনকে আমার মনের কথা যে ভাবে জানাতে চাই তা কেবল Reg.-এর আগেই সম্ভব। আর Reg. -এর পরে সাইন গিয়ে ইমনকে এসব কথা বলার কোনো মানে থাকবে না।

আমার মনের কথা গুলো যদি ইমনকে না জানাতে পারি তাহলে জীবনে একটা বড় অসম্পূর্ণতা থেকে যাবে। আমি কখনো শান্তি পাব না।

একদিন সাইনের সাথে স্কুল মাঠে দেখা হল ওকে জিজ্ঞাসা করতে ও বলল ''আমার সাথে দেখা হয় না।''

আমি একটু অস্বস্তির সাথেই সাইনকে বললাম, ''তুই তো আমার ব্যাপারটা বুঝতে পারছিস দয়া করে একটু চেষ্টা করে দেখ না ওকে কথাগুলো বল, না হলে -

''আচ্ছা দেখছি।''

ছেলে এবং মেয়েদের আলাদা আলাদা দিনে Reg. Form ফিলাপ করা হয়। মেয়েদের প্রথম দিন আর ছেলেদের দ্বিতীয় দিন। মেয়েদের Reg. Form ফিলাপ-এর দিন স্কুলে গেলাম। বন্ধু-বান্ধবীদের কাছে ইমনের খোঁজ করাতে কেউ কিছু বলতে পারল না। অবশ্য আমি ওদের সাথে এমনভাবে কথাবার্তা বলেছি যে কেউ বুঝতেই পারিনি আমি ইমনের ব্যাপারে কিছু জানতে চেয়েছি।

আজ ছেলেদের Reg.। একটু সকাল সকাল স্কুলে গেলাম। মনটাও খুব খারাপ তবু বন্ধুদের কিছু বুঝতে দিচ্ছি না। ওদের সাথে হেসে খেলেই কথা বলছি। কিন্তু সাইন ঠিকই বুঝতে পারছে যে আমার মনের মধ্যে কী হচ্ছে।

ইম আজ Reg.-এর জন্য স্কুলে এসেছে। আগের দিন ও কোনো কারণবশত স্কুলে আসতে পারিনি। ওই খোঁজটাই নেওয়ার জন্য আমি আগের দিন স্কুলের এসেছিলাম যে ইমনের Reg. করা হয়ে গিয়েছি কিনা। যাই হোক, আজই শেষ সুযোগ ওকে কথা গুলো বলার। ইমনকে দেখেই আমার মুখটা কেমন জানি মুষড়ে পড়ল। মনের ভিতর উত্তেজনা আরও বেড়েই যাচ্ছে। আর থাকতে পারলাম না সাইনকে ডেকে নিয়ে স্কুলের বাইরে গিয়ে বসে পড়লাম।

- ''ওই ইমনকে বল না।''

- ''সত্যি কথা বলব আমি ইমনকে অনেক আগেই কথা গুলো বলতে পারতাম কিন্তু -

- কিন্তু কী?

-''ইমন আর ময়ূরের ব্যাপারে একটা খবর শুনেছি। খবরটা শুনে আমি লজ্জায় মান-সম্মানে ওকে কিছু বলতে পারি নি।''

- ''কী খবর? আমাকে ব্যাপারটা খুলে বল না। আর তুই আমাকে এত দিন বলিসনি কেন?''

-''ওদের সম্পর্কটা বহুদিনের বহু গভীরের। এই গভীর সম্পর্কের বাঁধন আরও সুদৃঢ় করতে ওর স্থূল আনন্দে মেতেছে। স্থূল আনন্দের মানে নিশ্চয় তোকে আর বলে দিতে হবে। আর এসব কুকর্ম করতে দিয়ে ওরা ধরাও পড়েছে। এসব নিয়ে ওদের পরিবারে ঝামেলা চলছে।'' এই বলে সাইন চুপ হয়ে গেল।

কথাটা শুনে আমি কিছুক্ষণের জন্য যেন বোবা হয়ে গেলাম। আমার কান দুটো কথাগুলিকে যেন মেনে নিতে পারলন না। কিন্তু বাস্তবতার উপর আর অন্য কিছু সত্য হতেই পারে না। খবরটা আমি শুনেছিলাম যে, ওদের সম্পর্কটা জানাজানি হওয়ায় ওদের পরিবারে ঝামেলা চলছে কিন্তু এতদূর না।

আমার রক্তিম আভাসিত চোখ শেষবারের জন্য অনুরোধে কাতর হয়ে উঠল ''দ্যাখ আমি তো আর ইমনকে পাওয়ার জন্য তোকে কথা গুলো বলতে বলছি না একথা ওকে জানতেই হবে নইলে একটা বিশাল অপূর্ণতা আমার মনের ভিতর গভীরে সারাজীবন দগ্ধিত হতে থাকবে। আমি শান্তি পাব না তোকে অত গল্প সাজিয়ে বলতে হবে না অল্প করেই বলে।

-''এটা হয় না, তুই বুঝতে পারছিস না। তুই শুধু তোর মনের ইমনের কথা ভাবছিস কিন্তু বাস্তবের ইমন তার চরিত্র এটা একটু ভাব। ওর কথা ভাবতেই আমার খারাপ লাগছে।

কথাটা সাইন আমাকে এমনভাবে বলল যে, এর কোনো প্রত্যুত্তর আমি খুঁজে পেলাম না। দুজনে চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে রইলাম। তারপর সাইন আমার হাতটা ধরে টেনে স্কুলের ভিতর নিয়ে গেল।

ইমনের Reg. হয়ে গেছে। ও বন্ধুদের সাথে গল্প করছে। আমি ওকে দেখতে দেখতে বন্ধুদের সাইডে একটা চেয়ারে চুপ করে বসে পড়লাম। আর গত চার বছরের কথা আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলাম। ধীরে ধীরে চোখ আরও লাল হয়ে এল। দুই হাত মুখে চেপে মাথাটা হেট করে নিলাম। সাইনের ও মন খারাপ।

কিছুক্ষণ পর আমার ডাক পড়ল Reg.-এর জন্য। সামনে ইমন দাঁড়িয়ে স্যারের সাথে কথা বলছে। আমার মনে মনে ওর সাথে কথা বলার খুব ইচ্ছা হল। টেবিলে নীল পেন থাকা সত্ত্বে ও পকেট থেকে কালো পেনটা বার করলাম এবং Form -এর উপর সিগনেটার করার আগে শেষ বারের মতো চোখ তুলে ইমনের দিকে তাকালাম সত্যি চাঁদের যদি কলঙ্ক না থাকতো হয়তো আজ চাঁদ এত সুন্দর মোহময়ী হত না এই দুনিয়ার কাছে।

মুহূর্ত

মোঃ কাইজার রহমান মোল্যা
সেমিস্টার - ৬, রোল - ১৫০

বসন্তের বিকালে খোলা বারান্দায় বসে মুগ্ধ বাতাসের সাথে চা খাওয়ার মজাটাই আলাদা আর তার সাথে সামনের রাস্তায় লোকজন ও গাড়িঘোড়ার চলাচল দেখতে বেশ লাগে। হঠাৎ, একটা খুব চেনা মুখ দেখতে পেলাম রিক্সায় বসে আছে সিগন্যালে আটকে। একদম কোনো পরিবর্তন হয় নি তার চেহারার। আমি হঠাৎই উঠে দাঁড়াতে লক্ষ করলাম সেও আমাকে দেখতে পেয়েছে। দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে আছি, চাপা উল্লাসে ও চাপা দুঃখে দুজনেরই চোখ দিয়ে জল পড়ছে। পড়ন্ত বিকালের সূর্যের আলো তার মুখে পড়ায় চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়া বিন্দু বিন্দু জলের কণা চিক চিক করছে। তার কোলে বসে থাকা বছর ৪ এর একটা ছোট্ট মেয়ে হাত ধরে টানতেই নিজেকে সামলে নিয়ে আঁচল দিয়ে চোখটা মুছে নিলো। দীর্ঘ ৫ বছর পর দেখা। মনে মনে সেই পুরানো স্মৃতি ভিড় করতে শুরু করলো। তখনও আমরা দুজন দুজনের দিকে তাকিয়েই আছি সিগন্যাল এর লাল আলো সবুজ হয়ে এলো। গাড়ি চলে যাচ্ছে দেখে আমি ওই দিকে তাকিয়েই যাচ্ছি হঠাৎ আব্বু ডাক শুনে নিজের জ্ঞান ফিরে পেলাম।

टूटा प्यार

खुदाका खाब से तु मिल या मुझे दुबारा
खुदा से एहि दुआ हे तुझे पानेका।
मुझे आब एहसास हुआ तेरे प्यारका
यव तु पेयलिवार मिलाथा मुझे
तव इतना प्यार नेहि दियाथा तुझे।।
खुदाका खाब से तु मिल या मुझे दुबारा
मुझे आब एहसास हुआ तेरे प्यारका।

फरिदा खातुन
4th Sem, Eng (Hons)
Roll-198

जुनून

तुम टूंट रहे हो अंधेरो में रोशनी,
खुद रोशन कर सको तो चलो।
कहा रोक पायेगा रास्ता,
कोई जुनून वचा है तो चलो।
मेरे साथ साथ चल जिन्दगी,
थोडा ठेहरने तो दो।
जिन्दगी मे कितनी जिन्दगी हे
एहसास कर ने तो दो।।

Santanu Biswas
4th Sem, Eng (Hons)
Roll-198

BEING A WEB DEVELOPER

Mohibar Rahaman,
Data Manager, Bhangar Mahavidyalaya

As a web developer, I strive to code with grace
To craft with symbols, as with a quill
To shape the fabric of the cyberspace
And bend the machines to my will
As a web developer, I aim to design with flair
To sketch with logic, as with a paint
To harmonize the beauty and the utility fair
And produce wonders with a taint
As a web developer, I seek to solve with skill
To cut with reason, as with a blade
To construct the platforms for the human thrill
And greet the future unafraid
But in my role as a web developer, I face a daunting task
To learn from others, as from a tome
To find the splendor in the web's vast mask
And enhance my skills with every roam
But in my role as a web developer, I bear a heavy load
To relax and enjoy, as with a lyre
To cope with pressure and the deadline's goad
And take a break when things are dire
In my role as a web developer, I partake a joyous art
To express my passion, as with a verse
To craft the web that connects and sparks
And make my life and work diverse

The Incarcerated Poet

Tathagata Das
Associate Professor, Dept. of English

I am free, I am liberated!
Or is it an unreal thought!
An unreal dream, not to be
realized ever, never in my entire life?
I write, I criticize, I feel, I hope,
The myriad pictures of life
move me, assail me from
every quarter- the inadequacies
of man, his shortcomings, his
bloated ego that creates the barrier
between men.
I want to cry out, chastise, berate,
But am stopped, insulted, threatened,
The black and evil arm of power shamelessly
Exerts its ugly mien, choking my
throat, freezing the voice of protest   Yes, I feel confined, cornered,
By the invisible wall that stands as the obstacle.
The urge to express myself recedes
further and further, into the depths   While the Fakir dances, continuously,
incessantly, in all
His finery, and gloating over his
Ill-gotten wealth!

বছর কুড়ি পরে

ড. পূর্বাশা বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ

সেদিন ছিলো উতল হাওয়া, এক চিলতে
বারান্দা থেকে উড়িয়ে দিতাম রঙিন ফানুস।
জনারণ্যে একলা আমি, হৃদয় জুড়ে মশাল
মিছিল।
সেদিল ছিলো একটা আকাশ, দেউটি জুড়ে
একশো প্রদীপ। কখনো কখনো উদাস বাতাস,
উষ্ণ অনুভবের একলা রাত্রির।

আজকে আমার খেড়োর খাতা, জমা খরচ
লম্বা হিসাব। আসল আছে, সুদও ভালো,
আতস কাঁচে আশাবরী সুর।
আজকে আকাশ ছাদের পরে, হাজার বাতি
ঝাড় লন্ঠন জ্বলে। গহীন কোণে একলা বাউল
কেন, একটা আকাশ তেমনি করে
খোঁজে !

বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে

শান্তনু বিশ্বাস
সেমিস্টার - ৬, (ইংরাজী অর্নাস)

'বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে,
কিন্তু এখনও জীবন বাকি আছে।
যে পরিস্থিতি মাটিতে আঘাত করে
তারা এখনো উঠে উত্তর দিতে পারেনি।
আমি আমার গন্তব্যের দিকে হাঁটছি,
কিছু গন্তব্যে পৌঁছানো এখনও বাকি আছে।
লোকে আমার পরাজয়ের কথা বলুক,
সাফল্যের গোলমাল এখনও তৈরি হয়নি।
সময়কে তার কাজ করতে দিন,
আমার সময় এখনো আসেনি।
তারা আমাকে হেরে যাওয়া ভেবে প্রশ্ন করথে,
তাদের সকলের উত্তর এখনও পাওয়া যায়নি।
জীবনের মঞ্চে আমার চরিত্রে অভিনয় করছি,
পর্দা নামার সাথে সাথে করতালি বাজে।
এখনো হাতের বাইরে কিছুই যায়নি,
অর্জনের অনেক বাকি আছে....।''

আজও কেন যুদ্ধ ?

দেবদূত মুখার্জী
অধ্যাপক, ইংরাজি বিভাগ

এখানে এখনও যুদ্ধ ?
মানবসভ্যতার মহোৎসব !
সবাই জিততে চাই বলে হুঙ্কার !
হ্যা ! সবাই জিতবো, কেউ হারবোনা !
তাহলে কখন থামবে এই যুদ্ধ ?
আমার জানা নেই !
আপনার আছে ?
প্রশ্ন একটাই।
কেন এই যুদ্ধ ?
কোথা থেকেই বা আসে তার চিন্তা ?
কিভাবে মানুষ সৃষ্টি করে তার চরিত্র ?
ঠিক কোনখানে এই দৃঢ় পরিকল্পনার বসবাস ?
বিজ্ঞান কি তাহলে হেরে গেল ?
বিকাশ, উন্নয়ন বলতে কি এই যুদ্ধও বোঝায় ?
দেশে দেশে যুদ্ধ! মানুষে মানুষে যুদ্ধ!
মনে মনে যুদ্ধ! কিছুতেই বেরোনোর পথ নেই!
কি অসহায় আমরা!
শান্তির তিমিরে দাঁড়িয়েও যুদ্ধ!
এখানে কেন জানিনা যুদ্ধ লেগেই আছে!

ঝরা পাতার কাব্য

নাজমুন নাহার
অধ্যাপিকা, আরবী বিভাগ

শীতের পাতাঝরা নির্জনবনে
দাঁড়িয়ে আমি একাকী,
দেখি প্রকৃতি রসে এক বিষন্নরূপ।
বসন্ত আগমনের পূর্বে
পলাশের রক্ত জবায়
ভরে যাবার আগে,
বিচ্ছেদ বেদনার মুহূর্ত এক।
মানব মানবীর কান্নার শব্দ
করে শুস্ক পাতারা পরে ঝরে,
জীবনের সব গ্লানি পড়ুক ঝরে
ঝরা পাতার মত।
বসন্তের আগমনে প্রকৃতির সজীবতায়
জীবন হয় নবপ্রেমে উজ্জীবিত,
তেমন এক প্রাণবন্তায়
বিমর্ষ এ প্রকৃতি ছেয়ে যাক
নবউদ্দীপনায়, প্রেমময়তায়।
কল্লোলিত হোক রূপসী এ প্রকৃতি
মুগ্ধতায় উঠুক ভরে।
আর নয় সে বিষন্নতা, নয় বিচ্ছেদ
হোক তা মিলনের আহ্লাদ
প্রকৃতি সজ্জীবিত হবার উৎসবে।

তুমিই সেই নারী

আলমগীর উদ্দিন
সেমিস্টার - ৬, রোল - ৩১০

নারী, তুমি জননী,
তোমার মধ্যেই প্রাণ ভোমরা লুকিয়ে রয়েছে এ ধরণী।
নারী, তুমি দেবী,
তোমায় ছাড়া অন্ধকার এ পৃথিবী।
নারী, তুমিই সেই ভাগ্যবতী,
যার মধ্যে সমস্ত প্রাচুর্যা ধরে রেখেছে এ ধরণী।
হ্যাঁ হ্যাঁ তুমিই সেই নারী, যাকে আমরা পূজেছি বারবার,
কিন্তু যাকে ধর্ষিতা বানাতে পিছপা হইনি একবার।
তুমিই সেই বাবার আদরের খুকু,
যে দিনের পর দিন, বাবা দাদার দ্বারা ধর্ষিতা হয়েও শব্দ করোনি এইটুকু।
তুমিই সেই কলঙ্কিনী,
যে পায়নি ন্যায় বিচার, পেয়েছে শুধু কামাতুরদের হাতছানি।।
তুমিই সেই প্রথম শিক্ষিকা,
যার নাকি যোগ্যতা নেই হতে সন্তানের অভিভাবিকা।
তুমিই সেই লক্ষ্মী রমণী,
সংসারে যার মতামতকে কোনো তোয়াক্কাই করা হয়নি।
হ্যাঁ তুমিই সেই অভাগিনী,
যে আমৃত্যু পুরুষতন্ত্রের দাসত্ব ছাড়া আর কিছুই করেনি।
কিন্তু আজ তোমায় বলি শোনো হে নারী,
তুমিও দিতে পারো তোমার নিজস্ব জীবনের পথে পাড়ি,
যেখানে থাকবে না পুরুষতন্ত্রের কোনো আগল,
ভেঙে ফেলবে তোমার পায়ের সমস্ত শিকল।
তুমিই হবে সেই বীরাঙ্গনা,
যার মধ্যে আশার আলো খুঁজে পাবে হাজারও অঙ্গনা।
আর সেদিনই তুমি হবে প্রকৃত নারী,
যেদিন সমবেত কণ্ঠে বলে উঠবে : হ্যাঁ আমরাও পারি।।

আমার বসন্ত

সুপ্রিয়া মন্ডল
সেমিস্টার - ৪, (ইংরাজী অর্নাস) রোল- ২০২

আমার বসন্ত হারিয়ে গেছে।
বসন্তের রং, ঝরাপাতা কোকিলের কুহুতানে -
আমার বসন্ত হারিয়ে গেছে।
মনে পড়ে যায় আমার সেই পুরোনো বসন্তকে,
কতই না রঙিন ছিল।
সে আজ অতীতের কন্টক মাত্র,
যা আমার কোমল হৃদয়কে বারবার বিধ্বস্ত করে চলেছে।
আমার বসন্ত হারিয়ে গেছে।
বসন্তের রঙের সাথে সাথে -
হারিয়ে গেছে আমার সবকিছুই।
আজ আমার বিধ্বংসী হৃদয়টাও ;
পাষাণে পরিণত হয়েছে।
কোনো কিছুতেই আর ফারাক পড়ে না।
না আছে কারোর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ,
না আছে কারোর জন্যে কোনো অভিমান।
আমার বসন্ত হারিয়ে গেছে।
হারিয়ে গেছে আমার আবারও রঙিন পথ,
রঙিন চোখ, রঙিন পোশাক।
থেকে গেছে শুধু একফালি সাদাকালো জীবন।
না ! জীবনের গাছটা এখনও মরেনি
ঝরে গেছে শুধু পাতাগুলি ;
প্রাণহীন রোবটকে যেমন চাবি ঘোরালে,
চলতে থাকে, তেমনই সেও চলে দিনরাত।
এবার শুধু নতুন পাতা গজানোর অপেক্ষায়।
হয়তো বা কখন কোনো একদিন -
আমার বসন্ত আবারও ফিরে আসবে।।

মুখ ও মুখোশ

রুমনা সরকার
অধ্যাপিকা (ইতিহাস বিভাগ)

আসলে বিক্রি হয়ে গেছে ঋজু মেরুদন্ডটাই...
যা ছিল গর্ব, যা ছিল অহংকার..
এমন গড্ডলিকা প্রবাহে ভেসে যাবে
তাতো কষ্ট কল্পনাতেও স্থান পায়নি...
আসলে কোনোকিছুই ধ্রুব নয়,
স্বার্থ যখন জীবনের চালিকা শক্তি
তখন ন্যায় অন্যায় বোধই বিলুপ্ত...
ভুল হয়েছিলো মানুষ চিনতে -
মুখোশের আড়ালে ঢাকা ছিল এই মুখটা...
আজ সরে গেছে মুখোশের আবরণ
অবশেষে প্রকৃত সত্যের উন্মোচন..

এক মুঠো ভাত

সাইদুল মোল্যা
সেমিস্টার - ২, (এডুকেশন) রোল- ২৯০

পথের ধারে বাঁধা শিশু
খিদের যন্ত্রণায় মোচড় দিয়ে কাঁদে
তাদের দরকার এক মুঠো ভাত।
উনুনে বসানো হাঁড়ি ফুটছে জল
নেই অন্ন দানা, দরকার
এক মুঠো ভাত।
বিবেক, বুদ্ধি, জ্ঞান এখন
ওজন দরে পাওয়া যায়
পাওয়া যায় না এক মুঠো ভাত।
দয়া মায়া উঠে গেছে সভ্যতার সাথে সাথে
এখন হাঁড়িতে অন্ন পড়ে না।
এক মুঠো ভাত, এক মুঠো ভাত
বলে কাতরায় বিধাতার দরবারে
তবু হাঁড়িতে জল ফোটে না।

কেউ যদি জানতো

প্রিয়া পাল
সেমিস্টার - ৪, (এডুকেশন) রোল- ১৩৩

কিভাবে আছি,
কিভাবে বাঁচি...
কেউ যদি জানতো।

কত জল...
কত মেঘের দল.
বুকে বাসা বেঁধে আছে -
কত ভারি হয়ে ঝরে
সেই মেঘ চোখ বেয়ে
কেউ যদি জানতো !

এই পিছিয়ে থাকা জীবন,
এই ভাঙা মন -
কেন এত নীরবতা,
কেন এই একলা থাকা
কেউ যদি জানতো !

কেউ যদি জানতো ...
একটা মানুষ কতটা ব্যথা পেলে
নিশ্চুপ হয়ে যায়,
জীবন থেকে কতটা পিছিয়ে গেলে
জীবন থেকে কেউ মুখ ফিরিয়ে নেয়।
একবার শুধু একবার যদি কেউ জানতো !

জীবন যেমন

নূর মোহাম্মদ মোল্লা (অপু)
শিক্ষা-সহায়ক (কর্মী)

জীবন পথে প্রতি বাঁকে চমক,
ঠিক যেন নদীর চলার ঠুমক..
সুখ দুঃখ নিয়ম আসে চক্রাকারে,
জোয়ার ভাঁটার মতোই নিয়ম করে...
চিরস্থায়ী নয় কিছু এ জীবনে,
‘চরৈবেতি’ মন্ত্র থাকুক মনে।
হার না মানার দৃঢ় অঙ্গীকার,
জীবন যুদ্ধ সহজেই হবে পার..
জীবনকে নাও ইতিবাচক ভাবে,
ভালো তুমি থাকবেই থাকবে।
দুর্বলের অস্ত্র স্বার্থ, ঈর্ষা হানাহানি..
যুক্তি, বুদ্ধি, ভালোবাসা জয় আনবে জানি..
আর কাঠিয়ে উঠে পরাজয়ের গ্লানি
নতুন ভোরে নতুন সূর্য দেখবে মানি।

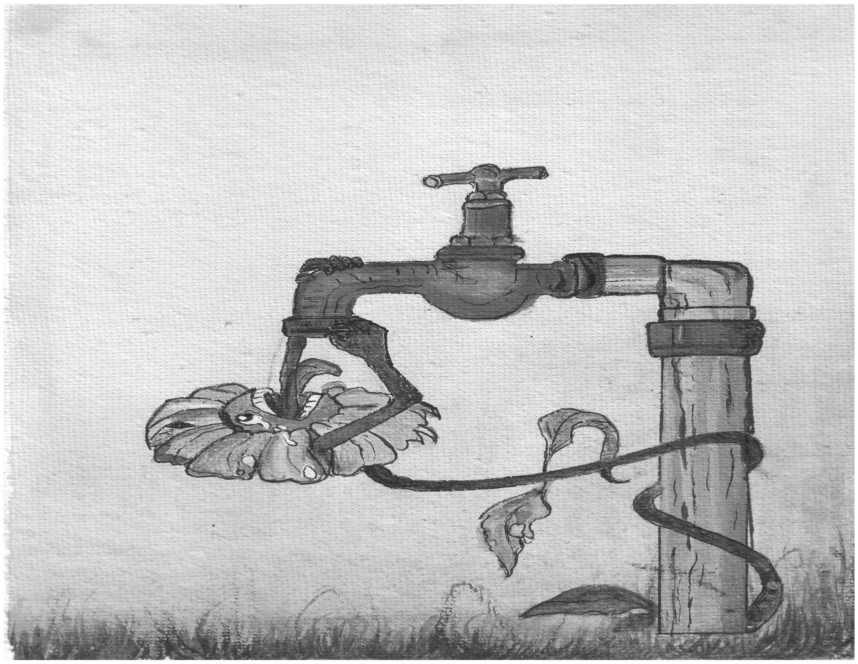

নারগিস পারভীন
ইতিহাস অনার্স, রোল - ৪৭

দিব্যেন্দু মন্ডল
সেমিস্টার - ৪, ইতিহাস অনার্স
রোল - ২৫৬

Bhangar Mahavidyalaya
Students' Council

Vice President	-	Sahin Baidya
General Secretary	-	Md Alamin Molla
Assistant General Secretary	-	Ariful Islam Azharuddin Molla
Games Secretary	-	Sakir Molla
Assistant Games Secretary	-	Samiul Islam Wasim Gazi
Cultural Secretary	-	Toufik Jaman Tuhin Mollick Biswajit Mondal
Aid Fund Secretary	-	Sahid Khan Jubil Molla Hakim Molla
Treasurer	-	Rohit Chowdhury
Assistant Treasurer	-	Tapas Mondal
Magazine Secretary	-	Saim
Assistant Magazine Secretary	-	Sofikul Islam
Canteen Secretary	-	Rajib Tarafdar
Common room Secretary	-	Asik

Bhasa Diwas

Excursion Dept of Political Science

Field Trip Geography

Excursion Department of History

Department of Sanskrit

Independence Day Celebration

Teachers' Day Celebration

Seminar organized by Dept of Economics

Nabin Boron & Anondo Lahari
(Cultural Programme)

District Champion 2022-23 (Football)

District Champion 2023-24 (Football)

Students' Council

Inauguration of Wall Magazine Dept of Education

College Picnic

Silver Jubilee Celebration

With Honourable Vice Chancellor
Dr Biswajit Ghosh, Neotia University